POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلّى على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

খণ্ড 11

সাপ্তাহিক
# বদর
কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 32

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বাৎসরিক চাঁদা
৬০০ টাকা

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 6 Aug 2026   22 সফর 1448 A.H

## আল্লাহ্‌র বাণী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۔ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۔ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ
نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۔

অনুবাদ: হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককেই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আগামীকল্যের জন্য সে অগ্রে কি প্রেরণ করিয়াছে। এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর উহা সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ সবিশেষ খবর রাখেন।

তোমরা সেই সকল লোকদের ন্যায় হইও না যাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে তিনিও তাহাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিয়া দিয়াছেন। ইহারাই দুষ্কৃতকারী। (আল হাশর: ১৯-২০)

## ‘কোনো মানুষের জন্য এতটুকুই মন্দ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করে।

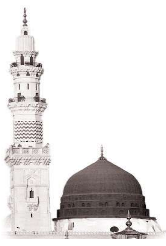

### মহানবী (সা.)- এর বাণী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ".

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন-

“তোমরা পরস্পর হিংসা করো না। পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করো না। একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং পরস্পরের শত্রুতা করো না। তোমাদের কেউ যেন অন্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর নিজের ক্রয়-বিক্রয় না করে।হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর অত্যাচার করে না, তাকে অপমান করে না এবং তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করে না।এরপর মহানবী (সা.) তিনবার নিজের বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ‘তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে।’কোনো মানুষের জন্য এতটুকুই মন্দ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করে। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান অন্য মুসলমানের জন্য হারাম (অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র)।” [সহীহ মুসলিম কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ. হাদীস-৬৫৪১]

### হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

## মানুষ দুনিয়ার কামনা-বাসনা ও ভোগ-বিলাসকেই জান্নাত মনে করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সেটিই জাহান্নাম।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- “ইসলামে প্রকৃত জীবন লাভের জন্য এমন একটি মৃত্যুকে গ্রহণ করতে হয়, যা অত্যন্ত তিক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে, শেষ পর্যন্ত সেই-ই প্রকৃত জীবন লাভ করে। হাদিসে এসেছে, মানুষ দুনিয়ার কামনা-বাসনা ও ভোগ-বিলাসকেই জান্নাত মনে করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সেটিই জাহান্নাম। আর সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আল্লাহর পথে কষ্ট স্বীকার করে, আর সেটিই প্রকৃত জান্নাত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই পৃথিবী নশ্বর এবং সবাই মৃত্যুর জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে। অবশেষে এমন এক সময় আসে, যখন সব বন্ধু, পরিচিতজন, আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়। তখন মানুষ যে সকল অবৈধ আনন্দ ও ভোগ-বিলাসকে আরাম বলে মনে করেছিল, সেগুলোই তিক্ততার রূপে প্রকাশিত হয়। প্রকৃত সুখ ও শান্তি তাকওয়া ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। আর তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা যেন বিষের পেয়ালা পান করার মতো। কিন্তু মুত্তাকির জন্য আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার স্বস্তি ও সুখের উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ‘যে আল্লাহকে ভয় করে (তাকওয়া অবলম্বন করে), আল্লাহ তার জন্য উত্তরণের পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।’ (সূরা আত-তালাক, ৬৫:৩-৪)

অতএব, প্রকৃত সুখ-সমৃদ্ধির মূলনীতি হলো তাকওয়া। কিন্তু তাকওয়া অর্জনের জন্য এভাবে শর্ত আরোপ করে চলা উচিত নয়। তাকওয়া অবলম্বন করলে যা চাইবে তাই পাবে। আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু ও অতি অনুগ্রহশীল। তাকওয়া অবলম্বন করো, তোমরা যা চাইবে, তিনি তা-ই দান করবেন।”

(মালফুযাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯০, ২০০৩ সংস্করণ, প্রকাশিত: রাবওয়া)

### তফসীরে কবীর

## ‘তাত্তাকূন’-এর আরেকটি অর্থ হলো-যদি তোমরা নিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তোমাদের রবের ইবাদত কর, তবে তোমরা পরস্পরের প্রতি জুলুম থেকেও রক্ষা পাবে

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা আল-বাকারার ২২ নম্বর আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে বলেন-

“‘তাত্তাকূন’ শব্দের অর্থ যেমন এমন সব বিষয় থেকে বিরত থাকা, যা আল্লাহ তা’আলা ও বান্দার পারস্পরিক সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়, তেমনি এর মধ্যে এমন সব বিষয় থেকেও বেঁচে থাকার ইঙ্গিত রয়েছে, যা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আল্লাহর ইবাদত মানুষকে এসব বিষয়ে ভুল করা থেকেও রক্ষা করে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলাকে নিজের রব বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে, সে অবশ্যই তাঁর বান্দাদের সঙ্গেও উত্তম সম্পর্ক স্থাপন করবে। আর এটাও অবশ্যম্ভাবী যে, সে মানুষের প্রতি কোনো অত্যাচার করবে না। কারণ যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ তা’আলার প্রকৃত বান্দা বানিয়ে নেয়, তার সমস্ত প্রয়োজনের জন্য তার দৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ তা’আলার দিকেই নিবদ্ধ থাকে, বিশেষত যখন সে আল্লাহকে নিজের রব বলে ঈমান রাখে।আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলাকে তার সকল প্রয়োজনের অভিভাবক বলে মনে করে, সে কখনো মানুষের সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি দেয় না। নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য সে অন্যের সম্পদে খিয়ানত করতে পারে না এবং তাদের প্রতি কোনো জুলুমও করতে পারে না।

অতএব, ‘তাত্তাকূন’-এর আরেকটি অর্থ হলো-যদি তোমরা নিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তোমাদের রবের ইবাদত কর, তবে তোমরা পরস্পরের প্রতি জুলুম থেকেও রক্ষা পাবে এবং পৃথিবীতেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের রবের প্রকৃত বান্দায় পরিণত হয়েছিলেন। দেখো, তাঁদের শাসনামলে পৃথিবী কতটা শান্তি লাভ করেছিল। এমনকি তাঁদের শত্রুরাও তাঁদের উত্তম আচরণের স্বীকৃতি দিয়েছিল। আজও হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর শাসনের স্মৃতি মানুষের হৃদয়ে অম্লান রয়েছে। হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর শাসনও তেমনই ছিল। তবে যেহেতু তাঁদের সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমি তাঁদের সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করিনি।” (তাফসিরে কবীর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০২, অনলাইন সংস্করণ)

### আহমদীয়া সংবাদ

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের প্রিয় নেতা হযরত খলিফাতুল মসীহ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা’আলা বিনাসরিহিল আজীয আল্লাহর অনুগ্রহে সুস্থ ও কুশল আছেন।

সকল আহমদী ভাই-বোন যেন হুজুরে আনওয়ার (আইয়্যাদাহুল্লাহু তা’আলা বিনাসরিহিল আজীয)-এর সুস্বাস্থ্য, কর্মময় দীর্ঘায়ু, মহান লক্ষ্যসমূহে সফলতা এবং বিশেষ নিরাপত্তার জন্য নিয়মিত দোয়া করতে থাকেন।

আল্লাহ তা’আলা যেন প্রতিটি মুহূর্তে হুজুরের হেফাজতকারী ও সাহায্যকারী হন এবং তাঁকে সর্বদা নিজের সমর্থন ও বিজয় দান করেন। আমীন।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

সম্পাদকীয়

# জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন

**জলসা সালানা লন্ডন ২০২৬ উপলক্ষে হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয)-এর উদ্বোধনী ভাষণের সারসংক্ষেপ**

## যেমন রাত ও দিন একসঙ্গে থাকতে পারে না, তেমনি ঈমান ও পাপও একসঙ্গে থাকতে পারে না।

সাইয়্যিদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) ২ আগস্ট ২০১৯, জুমার দিন, জামাআতে আহমদিয়া ইউকের জলসা সালানার উদ্বোধনী অধিবেশনে এক অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

হুযূর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) আহমদিয়াতের পতাকা উত্তোলনের পর দোয়া পরিচালনা করেন এবং বিকেল ৪টা ৩৭ মিনিটে জলসাস্থলে এসে সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। এরপর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

অধিবেশনের সূচনা হয় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। কাবাবীরের মুকাররম রাশিদ খাত্তাব সাহেব সূরা আলে ইমরানের ১৯১ থেকে ১৯৬ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন। এরপর এসব আয়াতের উর্দু অনুবাদ পাঠ করেন মাওলানা নাসির আহমদ কামার সাহেব (অতিরিক্ত ওকিলুল ইশাআত, লন্ডন)।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর ফারসি কাব্য থেকে কয়েকটি শের মুকাররম সৈয়দ আশিক হুসাইন সাহেব এবং হুযুর (আ.)-এর উর্দু কাব্য থেকে কয়েকটি শের মুকাররম মুসাওয়ার আহমদ সাহেব (অস্ট্রিয়া) সুললিত কণ্ঠে পাঠ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

বিকেল ৫টা ৪ মিনিটে হুযূর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) মিম্বরে এসে জলসায় উপস্থিত সবাইকে এবং এমটিএ-এর মাধ্যমে বিশ্বের সকল উপস্থিত, শ্রোতা ও দর্শককে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলে শুভেচ্ছা জানান এবং উদ্বোধনী ভাষণ শুরু করেন।

তাশাহহুদ, তাআউয এবং সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর হুযুর সূরা আলে ইমরানের ১৯৪ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং তার অনুবাদ পাঠ করেন।

এরপর হুযুর বলেন, আজ আমাদের এখানে সমবেত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো এই ঘোষণা ও প্রকাশ করা যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে মানার তাওফীক দান করেছেন। তিনি আমাদের আল্লাহ তা'আলা ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশাবলীর ওপর আমল করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ও মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুসরণ করলেই আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর হতে পারে।

হুযুর আনওয়ার সূরা আলে ইমরানের ১৯৪ নম্বর আয়াতের প্রসঙ্গে বলেন, যদি আমাদের আমল এই শিক্ষার অনুরূপ না হয়, তবে আমাদের ঈমান আনার দাবি সম্পূর্ণ ফাঁপা হয়ে যাবে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের আত্মসমালোচনা করা প্রয়োজন এবং প্রকৃত ঈমান অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি অনুসন্ধান করা দরকার। আমাদের নিজেদের মধ্যে কি সেই গুণাবলি সৃষ্টি হয়েছে, যা একজন প্রকৃত মুমিনের জন্য অপরিহার্য? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে কী কী মানদণ্ড স্থাপন করেছেন?

এরপর হুযূর আনওয়ার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্‌ধৃতির আলোকে ঈমানের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলার সত্তার প্রতি প্রকৃত ঈমান থাকে, তবে মানুষ কখনোই পাপের দিকে যেতে পারে না। একইভাবে তিনি বলেন, মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন। তাকওয়া ছাড়া মানুষের পক্ষে পাপ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

হুযুর বলেন, মানুষ তখনই পাপের দিকে অগ্রসর হয়, যখন সে মনে করে যে সে একা। আর মানুষ একা-এই ধারণা নাস্তিকতাপূর্ণ চিন্তা।

তাকওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে হুযুর বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, পবিত্র কুরআনের সূচনাতেই তাকওয়ার কথা এসেছে। দ্বিতীয় সূরার শুরুতেই "হুদাল্লিল মুত্তাকীন" (এটি মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশ) বলা হয়েছে। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হলে পাপের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়।

হুযুর আরও বলেন, তাকওয়ার চেয়ে বড় কোনো সফলতা নেই। বর্তমান যুগে তাকওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহর প্রেরিতগণ পৃথিবীতে আসেন তাকওয়া প্রতিষ্ঠার জন্য, আর এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাকওয়া অর্জনের প্রতিই বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

তিনি মুত্তাকিদের সম্পর্কে বলেন, কেবল মুত্তাকিরাই মুক্তি লাভ করে এবং তারা এমন উৎস থেকে রিযিক পায়, যা তারা কল্পনাও করতে পারে না। একইভাবে একটি হাদিসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকির অভিভাবক হয়ে যান।

নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে হুযুর বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর মহিমা মানুষের অন্তরে বৃদ্ধি পায়।

তিনি আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, প্রকৃত ঈমান হলো সব প্রয়োজন কেবল আল্লাহ তা'আলার কাছেই পেশ করা। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি সুন্দর উপমা উল্লেখ করে বলেন, যেমন রাত ও দিন একসঙ্গে থাকতে পারে না, তেমনি ঈমান ও পাপও একসঙ্গে থাকতে পারে না।

এই ভাষণে হুযুর আনওয়ার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে বাইআতের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কেবল বাইআত করার ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত না হবে, ততক্ষণ মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। কোনো ব্যক্তি যদি নিজে আমলকারী না হয়, তবে বাইআতের কোনো উপকার নেই।

হুযুর আনওয়ার নেক আমল ও ইস্তিগফার সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উদ্‌ধৃতিগুলোও পাঠ করে শোনান।

জামাআতের সদস্যদের উদ্দেশে তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনকে গল্পের বইয়ের মতো পড়া উচিত নয়। বরং কুরআন একটি নূর, একটি জীবন্ত ও উজ্জ্বল গ্রন্থ।

তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মহিমান্বিত বাণীর মাধ্যমে জামাআতে আহমদিয়ার মর্যাদা তুলে ধরেন এবং বলেন, যারা এই জামাআতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাদের জীবন সাধারণ দুনিয়াদার মানুষের মতো হওয়া উচিত নয়। কেবল এই দাবি করা যে আমরা জামাআতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আমলের কোনো প্রয়োজন নেই-এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থা, যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর জামাআতের সদস্যদের যে কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে হুযুর আনওয়ার নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখ করেন-

* তোমরা যদি আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকো, তবে আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণ করো।
* নিজেদের আমলের মাধ্যমে প্রমাণ করো যে, সত্যপন্থীদের দল তোমরাই।
* নতুন জীবনযাপনকারী মানুষে পরিণত হও।

ভাষণের শেষে হুযুর আনওয়ার সমগ্র বিশ্ব এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে পৃথিবীর জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তা'আলা বিশ্বকে যুদ্ধের দিকে ধাবিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং আমরা যেন বিশ্বে ইসলামের পতাকাবাহী হতে পারি।

হুযুর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয)-এর এই ভাষণ সন্ধ্যা ৬টা ১২ মিনিটে সমাপ্ত হয়। এরপর সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হুযুর আনওয়ারের নির্দেশনা মনোযোগসহকারে শোনা, তা অনুধাবন করা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তার ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।(সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল)

### মহানবী (সা.)-এর বাণী

**আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)**

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

## আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্মবিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, "আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মানি। আমরা ফেরেশতা, কেয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) 'হারাম'তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল'তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দিই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশি করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি- আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান। (মজমুআয়ে ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০-৫১)

# জুমআর খুতবা

# মহানবী (সা.)-এর দানশীলতা ও বদান্যতার আদর্শ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১২ জুন , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (১২ এহসান, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করেন,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔ (البقرہ:275)

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۔ (الذّاريات: 20)

প্রথম যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি তা সূরা বাকারা'র। এর অনুবাদ হলো, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ দিনে ও রাতে, গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে, আর তাদের কোনো ভয় নাই এবং তারা দুঃখভারাক্রান্তও হবে না। (আল বাকারা: ২৭৫)

আর দ্বিতীয় আয়াতটি আয-যারিয়াতের। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আর তাদের ধন-সম্পদে সাহায্যপ্রার্থীদেরও অধিকার রয়েছে এবং যারা সাহায্য চাইতে পারে না তাদেরও অধিকার রয়েছে।" (আল জারিয়া:২০)

আজ আমি মহানবী (সা.)-এর দানশীলতা ও বদান্যতার আদর্শ সম্পর্কে কতিপয় রেওয়ায়েত উপস্থাপন করব। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এ বিষয়ে তিনি (সা.) কীভাবে বারবার মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং একইভাবে তাঁর নিজের ব্যবহারিক আদর্শও কেমন ছিল।

এই আয়াতদ্বয় যা আমি পাঠ করেছি, যেমনটি আমি বলেছি, এতেও এবং অন্যান্য অনেক আয়াতেও আল্লাহ্ তা'লা হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার) প্রদান করার, ধর্মীয় প্রয়োজন এবং অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ করার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর এই নির্দেশের আলোকে মহানবী (সা.) প্রকৃত মু'মিনের দৃষ্টিও এ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করেছেন আর সর্বোপরি নিজের ব্যক্তিগত আদর্শ উপস্থাপন করেছেন এবং নিজের জীবনাদর্শের আলোকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ব্যবহারিক চিত্র আমাদের দেখিয়েছেন।

অতএব কেবল একটি বৈশিষ্ট্যই নয়, বরং তাঁর (সা.) জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পবিত্র কুরআন সম্মত ছিল। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে বলেছিলেন, ***'কানা খুলুকুহুল কুরআন'।***

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৪৪, হাদীস-২৫১০৮)

অর্থাৎ তাঁর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কুরআন সম্মত। যেকোনো বৈশিষ্ট্যের দিকেই তাকান না কেন, তিনি ছিলেন এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত, যার চেয়ে উন্নত আর কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে না।

যাইহোক, যেমনটি আমি বলেছি, আজ তাঁর দানশীলতা ও বদান্যতার বৈশিষ্ট্যের বরাতে কিছু রেওয়ায়েত উপস্থাপন করব।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এই বাক্যাবলি পাঠ করে দোয়া করতেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَاَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ্! আমি কার্পণ্য থেকে, আলস্য থেকে, জরাজীর্ণ বয়স থেকে, কবরের আযাব থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর নৈরাজ্য থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

[সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দুয়া, হাদীস-৪৮৬৫)

একইভাবে এ বিষয়ে এই দোয়াটিও রয়েছে। হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) এই দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْٓ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অক্ষমতা/দুর্বলতা ও অলসতা থেকে, ভীরুতা ও কার্পণ্য থেকে, ঋণের বোঝা ও মানুষের আধিপত্য থেকে'।

[সহীহ্ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৬৩৬৯)]

একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় এবং বান্দাদের সাহায্য করার বিষয়ে তিনি (সা.) মু'মিনদের এই উপদেশও দিয়েছেন।

হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে বলেছেন, 'থলের মুখ বেঁধে রেখো না। খোলো (তথা ব্যয় করো), অন্যথায় তোমাকেও তা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে' [সহীহ্ বুখারী]। অর্থাৎ, তুমি তোমার সম্পদ যাতে জমা করে রেখেছ তার মুখ বন্ধ করে রেখো না বরং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয়করতে থাকো এবং অন্যদের সাহায্য করো। আরেকটি রেওয়ায়েতে এই শব্দগুলো রয়েছে, 'গণনা করতে থেকো না কিংবা গুনে গুনে দিও না, অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লাও তোমাকে গুনে গুনে দেবেন'।

[সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৪৩৩]

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা যদি তোমাকে (তাঁর) অপার দানে ভূষিত করে থাকেন তাহলে তুমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব পালন করো। আর কৃতজ্ঞতার দায়িত্ব পালনের জন্য অন্যদের সাহায্য করো, (তাহলে) আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে আরও বাড়িয়ে দেবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'দানশীল আল্লাহ্‌র নিকটে, জান্নাতের নিকটে, মানুষের নিকটে কিন্তু আগুন (বা জাহান্নাম) থেকে দূরে; আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে কিন্তু আগুনের (জাহান্নামের) নিকটে' [জামে তিরমিযী]। আর একজন দানশীল মূর্খ ব্যক্তি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লার নিকট কৃপণ ইবাদতকারীর চেয়ে অধিক প্রিয়।

[জামি তিরমিযি, আবওয়াবুল বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস-১৯৬১]

কৃপণ ইবাদতকারী হলেও তার তুলনায় একজন মূর্খ দানশীলকে আল্লাহ্ তা'লা বেশি পছন্দ করেন।

একইভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'ধোঁকাবাজ, কৃপণ এবং অধিক খোঁটা দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। [জামে তিরমিযী] এই তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো: প্রতারক, কৃপণ ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কাউকে অনেক বেশি খোঁটা দেয়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

[জামি তিরমিযি, আবওয়াবুল বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস-১৯৬৩]

একইভাবে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, মু'মিন সরলমনা ও দানশীল হয়, আর পাপাচারী হয় প্রবঞ্চক ও ইতর।

[জামি তিরমিযি, আবওয়াবুল বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস-১৯৬৪]

সরলমনা বলতে এটি বোঝায় না, যেটি আমাদের ভাষায় কিছু লোক মনে করে যে, সরলমনা অর্থ হলো নির্বোধ- বরং মু'মিন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মুমিন তো প্রজ্ঞায় অনেক সমৃদ্ধ থাকে।

[জামি তিরমিযি, কিতাব তফসীরুল কুরআন, হাদীস-৩১২৭]

এবং মু'মিনের প্রজ্ঞারও অনেক গুরুত্ব রয়েছে। তা থেকে সতর্ক থাকা উচিত; এখানে উদ্দেশ্য হলো সে ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলে, দয়ালু, অনেক উদার মনের অধিকারী এবং মানুষের কাছে পছন্দনীয় ও সম্মানযোগ্য।

কাজেই, এটি হলো মুমিনের বৈশিষ্ট্য এবং এটি হলো আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করার একটি মানদণ্ড।

মুতাররিফ (রা.) তাঁর পিতার বরাতে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই, তখন তিনি (সা.) 'আলহাকুমুত তাকাসুর' [অর্থাৎ সূরা তাকাসুর] পাঠ করছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, আদম সন্তান বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। [অর্থাৎ মানুষ একথা বলে, ধণাঢ্য ব্যক্তি বলে, এগুলো আমার সম্পদ, আমার সম্পদ।] তিনি (সা.) বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার সম্পদ তো কেবল তা-ই যা তুমি খেয়ে হজম করে ফেলেছ, পরিধান করে পুরোনো করেছ অথবা সদকা দিয়েছ এবং অগ্রে (পরকালের জন্য) প্রেরণ করেছ।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রিকাইক, হীদস-৫২৪৪)

কাজেই, সবচেয়ে উত্তম সম্পদ, তিনি (সা.) বলেছেন, তোমার সম্পদ তো তা-ই যা তুমি ব্যয় করেছ, অর্থাৎ উত্তম সম্পদ সেটিই যা তুমি সদকা হিসেবে দিয়েছ এবং তা তুমি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের জন্য দিয়ে দিয়েছ, তাঁর পথে ব্যয় করেছ; এই সম্পদই

তুমি পরকালে বহুগুণ বর্ধিত আকারে পাবে। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তাদের কোনো ভয় থাকবে না যেমনটি আয়াতে বলা হয়েছে, এবং তারা দুঃখভারাক্রান্তও হবে না, কারণ তারা যেসব কুরবানী দিয়েছে, যে দান-খয়রাত তারা করেছে, যে সম্পদ তারা অন্যদের পেছনে ব্যয় করেছে তা তারা পরকালে পাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বলতেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, কেবল দুটি ক্ষেত্রেই ঈর্ষা করা বৈধ। একটি হলো সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দেন এরপর তাকে যথাস্থানে হাতখুলে তা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করার সামর্থ্য দেন; এবং অপরটি হলো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ প্রজ্ঞা দান করেছেন, আর তিনি সে অনুযায়ী মীমাংসা করেন ও আমল করেন এবং অন্যদেরকেও শিক্ষা দেন। [সহীহ্ বুখারী. কিতাবুল ইলম, হাদীস-৭৩]

অতঃপর এক স্থানে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেছেন, হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমার নিজের প্রয়োজন শেষে অতিরিক্ত সম্পদ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করা তোমার জন্য উত্তম। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তোমার যেসব প্রয়োজন রয়েছে তা নিঃসন্দেহে পূরণ করো, কিন্তু এর চেয়ে অতিরিক্ত যে সম্পদ রয়েছে তা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) ব্যয় করো, আর তা পুঞ্জিভূত করে রাখা তোমার জন্য মন্দ, তবে তোমাকে প্রয়োজনের পরিমাণ (গচ্ছিত) রাখার কারণে তিরস্কার করা হবে না। [তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না যে, প্রয়োজন পূরণের জন্য তুমি সম্পদ কেন জমা করে রেখেছিলে।] আর তুমি তার মাধ্যমে (খরচ) শুরু করো- যার লালনপালনের দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত। [খরচ করার রীতি হলো, তোমার যেসব দায়িত্ব রয়েছে, তোমার সন্তানাদি, তোমার স্ত্রী-সন্তান, তোমার দরিদ্র আত্মীয়স্বজন, অথবা যাদের লালনপালনের দায়িত্ব তোমার প্রতি অর্পণ করা হয়েছে, তারা তোমার সম্পদ থেকে সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম অধিকার রাখেন।] অতঃপর তিনি (সা.) বলেছেন, আর ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।[সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৭০৪]

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার কাছে তার নিজের সম্পদের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ বেশি প্রিয়? [এমন কেউ আছে কি যে বলবে, আমার উত্তরাধিকারীকে যে সম্পদ আমি দিয়ে যাচ্ছি তা আমার কাছে- আমি নিজের কাছে যা রেখেছি বা নিজের জন্য ব্যয় করছি তার চেয়ে বেশি প্রিয়?] লোকেরা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই যার কাছে নিজের সম্পদ বেশি প্রিয় নয়। যাহোক, আমাদের কাছে যা আছে তা-ই আমাদের বেশি প্রিয়।

তিনি (সা.) বলেন, তাহলে তার সম্পদ তা-ই যা সে অগ্রে (পরকালে) প্রেরণ করেছে এবং তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ তা-ই যা সে পেছনে রেখে গেছে।[সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, হাদীস-৬৪৪২]

যা তুমি অগ্রে প্রেরণ করেছ, (তথা) আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করেছ, দরিদ্রদের সাহায্য করেছ, তা-ই সবচেয়ে উত্তম। পরকালে তুমি এর প্রতিদান পাবে, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন।

সম্পদ অকৃপণভাবে ব্যয় করা এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা রাখার বিষয়ে তাঁর (সা.) নিজের ব্যবহারিক আদর্শ কেমন ছিল?

এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বেলাল (রা.)-র কাছে আসেন, তখন তার কাছে খেজুরের একটি স্তূপ রাখা ছিল। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, বেলাল! এগুলো কী? হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! এগুলো আমি আপনার জন্য এবং আপনার অতিথিদের জন্য জমা করে রেখেছি। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি এ বিষয়টিকে ভয় পাও না যে, এই স্তূপিকৃত সম্পদের ওপর জাহান্নামের গরম আঁচ এসে লাগবে?

অতঃপর তিনি (সা.) বেলাল (রা.)-কে উপদেশ দেন, হে বেলাল! ব্যয় করতে থাকো এবং আরশের অধিপতি খোদা থাকতে অভাব-অনটনের ভয় কোরো না। [আল মুজামুল কাবীর লিত তিবরানি, হাদীস-১০২০)

অতঃপর এ বিষয়ে তাঁর (সা.) নিজের আদর্শের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো,

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, তারা একটি ছাগল জবাই করান এবং এর মাংস গরিবদের মাঝে বণ্টন করেন এবং বাড়িতে খাওয়ার জন্যও কিছুটা রেখে দেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কতটুকু মাংস অবশিষ্ট আছে? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বলেন, শুধু সামনের পা রয়ে গেছে। [ছাগলের সামনের পায়ের যে রান বা অংশটি ছিল]। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, এই সামনের পা'টি বাদ দিয়ে তুমি যা বণ্টন করেছ তার পুরোটাই বেঁচে গেছে।

[কারণ এটি কারও কাজে আসেনি, আমাদের খাওয়ার জন্য তুমি রেখেছ। পরকালে সেটিই কাজে আসবে যা তুমি (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করেছ।] [জামে তিরমিযী, কিতাব সাফাতুল কিয়ামাহ, হাদীস-২৪৭০]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ভাষণ প্রদানের সময় বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমি তো কেবল বণ্টনকারী আর আল্লাহ্ই দান করেন। [সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস-৭১)

দানশীলতা ও বদান্যতার বৈশিষ্ট্য মহানবী (সা.)-এর কল্যাণময় সত্তায় (তাঁর) আবির্ভাবের পূর্বেও পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং এর সাক্ষী, যেমনটি আমরা পড়ে থাকি, তাঁর পবিত্র সহধর্মিনী হযরত খাদিজা (রা.) সেই সময় দিয়েছিলেন যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তিনি (সা.) ভীতসন্ত্রস্তঅবস্থায় বাড়ি ফিরে এসেছিলেন, তখন হযরত খাদিজা (রা.) বলেছিলেন, ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই; আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ কখনো আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, দুর্বলের বোঝা বহন করেন, এমন সব পুণ্যকর্ম করেন যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অতিথিসেবা করেন এবং সত্যিকার বিপদে (মানুষকে) সাহায্য করেন। [সহীহ্ বুখারী, কিতাব বাদউল ওহী, হাদীস-৩)]

এরপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন,

"দুটি অভ্যাস মুমিনের মধ্যে একত্রিত হতে পারে না: কৃপণতা এবং অসদাচরণ।" [জামি তিরমিযি, কিতাবুর বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস-১৯৬২]

অর্থাৎ, যে মুমিন তাঁর মাঝে কৃপণতাও থাকবে না, অসদাচরণও থাকবে না। এটিও নিজেকে যাচাই করার একটি মাপকাঠি।

এরপর কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেন, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, " অন্যায়-অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকো, নিশ্চয়ই অন্যায়-অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে। আর কৃপণতা ও লোভ থেকে বেঁচে থাকো, নিশ্চয়ই কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছিল। এই কৃপণতাই তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল, ফলে তারা রক্তপাত করেছিল এবং হারাম জিনিসকে হালাল সাব্যস্ত করেছিল।"

[সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস-৪৬৬১]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "কোনো বান্দার ভেতরে কখনও আল্লাহর পথের ধুলোবালি এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হতে পারে না, আর কোনো বান্দার হৃদয়ে কখনও লোভ কৃপণতা এবং ঈমান একত্রিত হতে পারে না।"

[সুনান নিসাঈ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৩১১২]

যেমনটি আগেও একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি লোভী, লালসাপূর্ণ এবং কৃপণ, সে কখনও মুমিন হতে পারে না। সুতরাং, এই হলো মাপকাঠি; মুমিন হতে হলে লোভ থেকেও বাঁচতে হবে, লালসা থেকেও বাঁচতে হবে এবং কৃপণতা থেকেও বাঁচতে হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, "এমন কোনো দিন নেই, যখন বান্দারা সকালে ঘুম থেকে ওঠে, আর দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না। তাঁদের মধ্যে একজন বলে, হে আল্লাহ্! ব্যয়কারীকে এর বিনিময় দান করো। আর অপরজন বলে, হে আল্লাহ্! কৃপণের সম্পদ ধ্বংস হোক। [সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৪৪২]

অর্থাৎ, যে ব্যয় করছে, তার বিনিময়ে তাকে আরও দাও; আর যে কৃপণতা করছে, তার সম্পদকে ধ্বংস করে দাও। এই জগতেও সেই সম্পদে বরকত হয় না- এটাই আমরা দেখি, অনেক মানুষ এই কথাই প্রকাশ করেন; আর পরকালেও এই সম্পদ তাকে কোনো উপকার দেবে না। আল্লাহ তা'লা এক জায়গায় বলেছেন, যারা আল্লাহর পথে, তাঁর ভালোবাসায় ব্যয় করে, তিনি এর প্রতিদান দেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ছিলেন মানুষের মাঝে সবচেয়ে সুন্দর, মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি দানশীল এবং মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সাহসী।[সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল, হাদীস-৪২৫২]

## মহান আল্লাহ্‌র বাণী

**সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৯)**

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

## যুগ ইমামের বাণী

**তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।**

**(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)**

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

একইভাবে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে সকল দানশীলদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দানশীল সম্পর্কে জানাব না?" এরপর তিনি (সা.) বলেন, "আল্লাহ হলেন সমস্ত দানশীলদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দানশীল আর আদম সন্তানদের মাঝে আমি সবচেয়ে বেশি দানশীল।"

[মাজমুয়ায়েয যোয়ায়েদ, ৮ খণ্ড, পৃ: ৪০৯, হাদীস-১৪১৭৮]

অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি দানশীল আমি।

একইভাবে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) কল্যাণ ও মঙ্গালের ক্ষেত্রে সকল মানুষের চেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন এবং রমজান মাসে তিনি সবচেয়ে বেশি দানশীল হতেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রতি বছর রমজানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, যতক্ষণ না রমজান শেষ হতো। মহানবী (সা.) তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাঈল (আ.) যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন (রমযানে) মহানবী (সা.) কল্যাণ ও মঙ্গালের ক্ষেত্রে প্রবল বেগে বয়ে চলা বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হতেন।

[সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস-৪২৫৪]

তিনি এমনভাবে ব্যয় করতেন যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

এই বিষয়টিকেই হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একটি খুতবায় এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি (সা.) দান করতেন, তা চূড়ান্ত পর্যায়ের হতো, এমনকি সাহাবীদের (রা.) বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি (সা.) বিশেষ করে রমজানে এমনভাবে দান করতেন যেন প্রবল বাতাস বয়ে যাচ্ছে। আর এর পাশাপাশি لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا -(১৭:২৭) এর ওপরও তাঁর আমল ছিল; অর্থাৎ দানশীলতাকে তিনি অযথা ও নিরর্থক হতে দিতেন না এবং বেমানান বা অনুপযুক্ত স্থানেও তা ব্যয় করতেন না। বদান্যতা তো ছিলই, কিন্তু আল্লাহ তা'লার এই নির্দেশও রয়েছে যে, অপব্যয় করা যাবে না, অকারণে নষ্ট করা যাবে না। আল্লাহ তা'লা অপব্যয় করতে নিষেধ করেছেন। হাতেম তাঈ-এর বদান্যতা তো ছিল, কিন্তু তা ছিল স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে। হাতেম তাঈ অনেক বড় দাতা হিসেবে পরিচিত, কিন্তু তার দানশীলতা পরিস্থিতি ও যৌক্তিকতা অনুযায়ী হতো না, বরং চিন্তাভাবনা ছাড়াই হতো; কারণ তা ছিল 'মিষ্টান্ন বিক্রেতার দোকানে বসে দাদার নামে ফাতিহা দেওয়ার' [অর্থাৎ অপরের অর্থে দানশীল সাজার] মতো বদান্যতা। নিজের কোনো সম্পদ নেই, বাবার সম্পদের ওপর তার কী অধিকার ছিল যে, সে তা বণ্টন করে দেবে? হাতেম তাঈ সম্পর্কে বলা হয় যে, শৈশব থেকেই তার স্বভাবের মাঝে বদান্যতা ছিল। অবশেষে তার বাবা যখন দেখলেন যে, 'সে তো আমার সম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছে', তখন তিনি তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন যে, 'গিয়ে উট দেখাশোনা করো'। একদিন সে দেখল যে, তিনজন লোক এসেছে, তারা ছিল বড় তিনজন কবি। সফরে তারা তাকে দেখতে পেল। তখন তাদের মেহমানদারির জন্য সে তিনটি উট কুরবানি করে দিল। তারা বলল, 'আমরা তিনজন মানুষ, একটি উটই তো যথেষ্ট।' সে বলল, 'না, আমি যদি একটি জবাই করি, তবে বাকি দুজন পরজীবী হিসেবে গণ্য হবে।' তো বাবার সম্পদ ছিল, বিনামূল্যে পেয়ে তাদের জন্য সে তিনটি উটই জবাই করে দিল। কিছু গোশত হয়তো বেঁচে গিয়েছিল, বাকিগুলো নষ্ট হয়েছিল বা কাউকে দিয়ে দিয়েছিল, যাই হোক না কেন। এতে তার বাবারও খুব খারাপ লেগেছিল যে, আমার সম্পদ এভাবে লুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কাছে যে সম্পদ আসত, তা তাঁরই সম্পদ হতো এবং কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিস্থিতি ও যৌক্তিকতা বিবেচনা করে তিনি (সা.) তা ব্যয় করতেন।

এখানে সেইসব হাদীসের ব্যাখ্যাও চলে এসেছে যেখানে তিনি (সা.) বলেছেন যে, অকৃপণভাবে ব্যয় করো। এর মানে হলো, পরিস্থিতি ও যৌক্তিকতা বিবেচনা করে ব্যয় করো, আর তখন কোনো ধরনের দ্বিধা থাকা উচিত নয়। এর অর্থ এই নয় যে, জঙ্গালে তিনজন মানুষ এসেছে, আর তিনটি উট জবাই করে দাও এবং পরে সেগুলোর গোশত নষ্ট হয়ে যাক। কারণ, সেখানে তো খাওয়ার মতো আর কেউ নেই। নিশ্চয়ই জঙ্গালে আর কাউকে পাওয়া যায়নি। যদি দু-একজন পাওয়া গিয়েও থাকে, তবু কিছু না কিছু-বরং অনেকটা গোশতই বেঁচে গিয়েছিল, যা নষ্ট হয়েছে। এর কোনো লাভ নেই। তাই পরিস্থিতি ও যৌক্তিকতা বিবেচনা করে ব্যয় করা উচিত। যদি আল্লাহ তা'লার পথে ব্যয়করে থাকো এবং পরিস্থিতি ও যৌক্তিকতা অনুযায়ী ব্যয় করে থাকো, তবে নিশ্চিন্ত থাকো। কারণ, এটি আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি, যেমনটি আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেছেন যে, তাদের কোনো ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না। যাই হোক, হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এর বিপরীতে মহানবী (সা.) একদিকে তো এতটা দানশীল ছিলেন যে-যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে-সাহাবীগণ (রা.) বলেন, রমজানের দিনগুলোতে তিনি (সা.) এমনভাবে দান করতেন যেন প্রবল বাতাস বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অন্যদিকে তিনি ভেবেচিন্তে ব্যয় করার মানুষ ছিলেন। [খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৮, পৃ: ৬৪১]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) বলেছেন: "আমার কাছে যদি তিহামা পর্বতমালা, অর্থাৎ আরবের উপকূলীয় পর্বতমালার সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকত, তবে আমি তার সবটাই তোমাদের মাঝে বিলিয়ে দিতাম। আর তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বা কৃপণ হিসেবে পাবে না।"

[সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খণ্ড-৭, পৃ:৫৩]

একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবু যার (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম (সা.)-এর সাথে মদীনার প্রান্তরে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এমন সময় উহুদ পাহাড় আমাদের সামনে চলে এল। তিনি (সা.) বললেন, "হে আবু যর!" আমি বললাম, "হাজির আছি, ইয়া মহানবী।" তিনি (সা.) বললেন: "আমাকে এই বিষয়টি আনন্দিত করে না যে, আমার কাছে এই উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকবে আর আমি তৃতীয় রাত অতিবাহিত করব অথচ তা থেকে একটি দীনারও আমার কাছে মজুত থাকবে; তবে সেই অংশটুকু ছাড়া, যা আমি ঋণ পরিশোধের জন্য রেখে দেবো। বরং আমি অবশ্যই তা আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এইভাবে, এইভাবে এবং এইভাবে ব্যয় করে দেবো-অর্থাৎ নিজের ডানে, নিজের বাঁয়ে এবং নিজের পেছনে।" তিনি (সা.) চলতে থাকেন এবং এরপর বলেন: "যারা অনেক সম্পদশালী, কিয়ামতের দিন তারাই হবে নিঃস্ব।" অর্থাৎ, যারা সম্পদশালী, টাকা-পয়সা জমা করতে থাকে, অভাবগ্রস্ত ও গরীবদেও জন্য ব্যয় করে না, তারা কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে; তবে সে নয়, যে এইভাবে, এইভাবে, এইভাবে ব্যয় করে। যে ব্যক্তি ব্যয় করছে, অর্থাৎ নিজের ডানে, নিজের বাঁয়ে এবং নিজের পেছনে, সে কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে না। "আর তাদের সংখ্যা নেহাতই কম।" তিনি (সা.) বলেন, এমন লোক খুবই কম যারা এইভাবে আল্লাহর পথে ব্যয় করে। যারা সম্পদশালী মুমিন, তারা কৃপণতা করে না; বরং আল্লাহর পথে একজন সম্পদশালী মুমিন নির্ভয়ে ব্যয় করে থাকে, আর তখন আল্লাহ তা'লা তাদেরকে আরও বেশি দান করতে থাকেন।

[সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, হাদীস-৬৪৪৪]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে থাকা সমস্ত ছাগল চেয়ে বসল এবং তিনি (সা.) তাকে তা দান করে দিলেন। এরপর সে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! ইসলাম গ্রহণ করো। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সা.) তো এতো বেশি দান করেন যে, দারিদ্র্যের ভয় থাকে না।" হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, "মাঝেমধ্যে কোনো ব্যক্তি কেবল জাগতিক স্বার্থে ইসলাম গ্রহণ করত, কিন্তু যখনই সে ইসলাম গ্রহণ করত, তখন ইসলাম তার কাছে দুনিয়া এবং এর মধ্যকার সর্বকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে উঠত।"

[সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল, হাদীস-৪২৬২]

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন যে, মহানবী (সা.) আগামীকালের জন্য কোনো কিছু সঞ্চয় করে রাখতেন না।

[শামায়েলুন নবী (সা.), পৃ: ১৪৮]

হযরত উকবা বিন হারিস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) আমাদের আসরের নামায পড়ালেন, এরপর তিনি (সা.) তাড়াতাড়ি বাড়িতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরই বাইরে বেরিয়ে এলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি তাঁকে কারণ জিজ্ঞেস করলাম, অথবা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করল, তখন তিনি (সা.) বলেন: "আমি ঘরে সদকার সম্পদের মধ্য থেকে স্বর্ণের একটি টুকরো রেখে এসেছিলাম। আমি পছন্দ করি নি যে, সেটি সারা রাত আমার কাছে থাকবে। তাই আমি তা বণ্টন করে দিয়েছি।"

[সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৪৩০]

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন যে, মহানবী (সা.) আমার কাছে আসলেন এবং তাঁর চেহারার রঙ পরিবর্তিত ছিল। হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন যে, আমি ভাবলাম, কোনো কষ্ট বা ব্যথার কারণে এমন হয়ে থাকবে। তিনি বলেন যে, আমি নিবেদন করলাম, "হে আল্লাহর রসুল (সা.)! আমি আপনার চেহারার রঙ পরিবর্তিত দেখতে পাচ্ছি, কোনো কষ্টের কারণে কি এমনটা হয়েছে?" তিনি (সা.) বললেন: "না, সেই সাতটি দীনারের কারণে, যা সন্ধ্যায় আমাদের কাছে এসেছিল এবং রাত পার হয়ে গেছে অথচ আমরা সেগুলো ব্যয় করিনি। আমি বিছানার এক কোণে সেগুলোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম

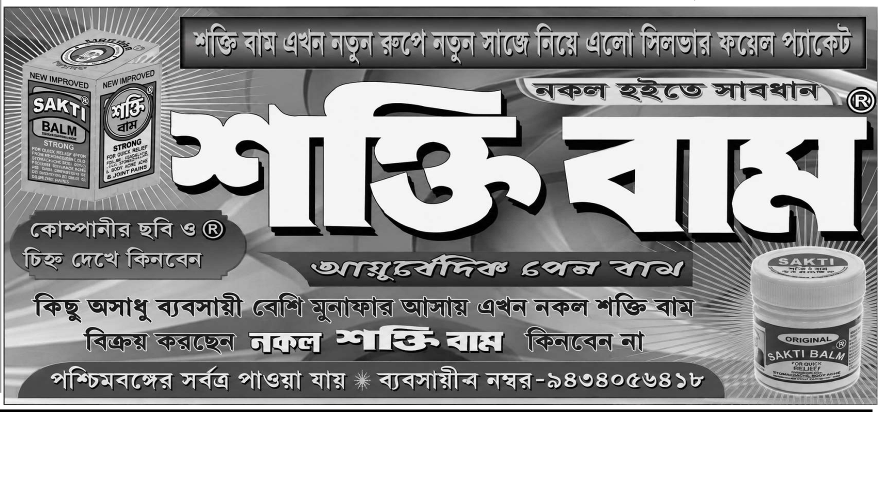

আর যখন আমার মনে পড়ল, তখন এ বিষয়ে আমার ভীষণ চিন্তার উদ্রেক হলো।" [মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৬৩০-৬৩১]

হযরত উকবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি মহানবী (সা.)-এর পেছনে মদীনায় আসরের নামায পড়লাম। তিনি (সা.) সালাম ফেরালেন এবং তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন আর মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে তাঁর পূত-পবিত্র স্ত্রীদের কক্ষের দিকে গেলেন। মানুষ তাঁর এই তাড়াহুড়ো দেখে ঘাবড়ে গেল। এরপর তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে এলেন এবং দেখলেন যে, তারা তাঁর এই তাড়াহুড়ো দেখে বিস্মিত হয়ে আছে। তখন তিনি (সা.) বলেন: "আমার কাছে কিছু স্বর্ণ ছিল, যার কথা আমার মনে পড়েছিল এবং আমি এটি পছন্দ করিনি যে, তা আমাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখবে। তাই আমি তা বণ্টন করে দেওয়ার জন্য বলে এসেছি।"

[সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৮৫১]

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর কাছে যা-ই থাকত তিনি তা দান করে দিতেন। একবার তাঁর ঘরে একটি মুদ্রা ছিল, তিনি সেটি নিয়ে বণ্টন করে দিলেন।"

[মালফুযাত, খণ্ড-৩, পৃ ৩২৩]

এই ঘটনাটির উল্লেখ করে অন্য এক স্থানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এভাবে লিখেছেন, একবার সদকার কিছু টাকা আসে এবং তা বণ্টন করার সময় একটি দীনার কোনো এক কোণায় পড়ে যায়, যা তুলে নেবার কথা তাঁর খেয়াল ছিল না। নামাযের পর মনে পড়লে তিনি লোকদের ঘাড় টপকে দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! কী ব্যাপার ছিল? তিনি বললেন, এভাবে একটি দীনার বণ্টন করা বাকি রয়ে গিয়েছিল। আমি চাইলাম যত দ্রুত সম্ভব সেটিও যেন বণ্টন করে দিই। যাইহোক, ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন উদারতা ও নির্লোভ মানসিকতা প্রদর্শন করেছেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, যা-ই আসত তিনি তা আল্লাহর রাস্তায় বণ্টন করে দিতেন।"

[তফসীরে কবীর, খণ্ড-৭, পৃ: ৪৭৯]

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে বাহরাইন থেকে ধনসম্পদ আনা হলো। তিনি বললেন, এটি মসজিদে রেখে দাও। এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ধনসম্পদ যা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আনা হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সা.) নামাযের জন্য বের হলেন এবং সেটির দিকে কোনো মনোযোগ দিলেন না, অর্থাৎ সেদিকে তাকালেন না। তিনি যখন নামায শেষ করলেন, তখন এসে সেই ধনসম্পদের কাছে বসলেন এবং যাকে দেখছিলেন তাকেই দান করছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে হযরত আব্বাস (রা.) আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমাকেও দিন, কারণ বদরের দিন আমি নিজের মুক্তিপণ দিয়েছিলাম এবং আকীলেরও মুক্তিপণ দিয়েছিলাম।ইনি ছিলেন হযরত আব্বাসের ভাতিজা, আকীল বিন আবু তালিব। রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, এর মধ্য থেকে নিয়ে নাও। তখন তিনি দুই হাত ভরে ভরে নিজের কাপড়ে নিলেন, তারপর তা উঠাতে চাইলেন কিন্তু উঠাতে পারলেন না। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! কাউকে আদেশ করুন যেন এটি আমাকে তুলে দেয়। তিনি বললেন, না, তা হতে পারে না। তিনি বললেন, তাহলে আপনিই এটি উঠিয়ে আমার ওপর রেখে দিন। তিনি বললেন, না, এটিও নয়। এরপর তিনি সেখান থেকে কিছু মালামাল বের করে দিলেন, তারপর আবার উঠাতে গেলেন কিন্তু তবুও উঠাতে পারলেন না। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! কাউকে আদেশ করুন যেন এটি আমাকে তুলে দেয়। তিনি (সা.) বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে আপনিই উঠিয়ে আমার ওপর রেখে দিন। তিনি বললেন, না। এরপর তিনি সেখান থেকে আরো কিছু মালামাল কমিয়ে দিলেন, তারপর তা উঠিয়ে নিজের কাঁধে রাখলেন এবং রওনা হলেন। যখন তিনি চলে গেলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) অনবরত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন যতক্ষণ না তিনি আমাদের দৃষ্টির আড়াল হলেন।

প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি (সা.) সাহাবীদের পরিমিতিবোধের উপদেশ দিতেন। অর্থাৎ ঠিক আছে– আমি দিচ্ছি, তোমরা নাও কিন্তু পরিমিতভাবে। সে যতই নিকটাত্মীয় হোক না কেন, মিতাচার বা পরিমিতিবোধ থাকা উচিত। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নাও, অতিরিক্ত নেওয়া উচিত নয়। এ হাদীসের শেষে বর্ণনাকারী এটিও লিখেছেন, মহানবী (সা.) তাঁর এই লোভ দেখে বিস্মিত হচ্ছিলেন। [সহীহ বুখারী, কিতাবুস সলাত, হাদীস-৪২১]

এটি বর্ণনাকারীর নিজস্ব ধারণা। এমনও হতে পারে যে, মহানবী (সা.) তার লোভ দেখে বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছিলেন না, বরং মহানবী (সা.)-এর সেই দারিদ্র্যের সময়কালের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল যা সাহাবীদের পূর্বের অবস্থা ছিল; আর সেটির কথা চিন্তা করে তিনি দূর পর্যন্ত তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন যে, কীভাবে এই লোকেরা কুরবানি বা আত্মত্যাগ করতে থেকেছে, কীভাবে তাদের ওপর দারিদ্র্যের দিন কেটেছে এবং আজ আল্লাহ তা'লা কীভাবে আমাদের নিয়ামত দান করছেন। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারকও এটিকে বর্ণনাকারীর নিজস্ব চিন্তাভাবনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। – এমনটি নয় যে, মহানবী (সা.) বিস্মিত হয়েছিলেন, সে কেন লোভ করছে, বরং ব্যাখ্যাকারীরা অন্যান্য বিষয়ের কথাই লিখেছেন।

[আল ইফসাহ আন মুয়ানি আস সিহাহ, খণ্ড-৫, পৃ: ৩২৩]

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, কখনো এমন হয় নি যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কোনো কিছু চাওয়া হয়েছে আর তিনি 'না' বলেছেন। [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস-৪২৬০]

হযরত সাহল বিন সাদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন, যখনই তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হতো, তিনি তা দান করে দিতেন।

[সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খণ্ড-৭, পৃ:৫০]

ইবনে আবী খায়সামা হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী যখন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুণাবলি বর্ণনা করতেন তখন বলতেন, তিনি (সা.) দান করার দিক থেকে সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি দাতা ছিলেন।

[সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খণ্ড-৭, পৃ:৫২]

হযরত সাহল বিন সাদ (রা.) বর্ণনা করেন, এক মহিলা একটি 'বুরদাহ' অর্থাৎ একপ্রকার চাদর নিয়ে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! এটি আমি নিজের হাতে বুনেছি আপনাকে পরিধান করানোর জন্য। মহানবী (সা.) সেটি গ্রহণ করলেন যেন তাঁর এটির প্রয়োজন ছিল। তারপর তিনি আমাদের কাছে আসলেন এবং সেই চাদরটিই তহবন্দ হিসেবে পরিধান করেছিলেন, বেঁধে রেখেছিলেন। লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! এই চাদরটি আমাকে পরিধান করার জন্য দিয়ে দিন। তিনি (সা.) বললেন, ঠিক আছে। মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ মজলিসে বসে রইলেন, তারপর ভেতরে গিয়ে সেটি ভাঁজ করলেন এবং সেই ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে কাপড় বদলে অন্য চাদর পরে আসলেন। লোকেরা সেই ব্যক্তিকে বলল, তুমি তাঁর কাছে এটি চেয়ে ভালো করো নি। তুমি তো জানো, তিনি কোনো যাচনাকারীকে ফিরিয়ে দেন না। তখন সেই ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আমি এটি এজন্য চেয়েছি যেন আমি যখন মারা যাব, তখন এটি আমার কাফন হয়। লেখা আছে, হযরত সাহল বলেছিলেন, পরবর্তীতে সেই চাদরটিই তার কাফন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

[সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুইয়ু, হাদিস-২০৯৩০

অন্য একটি রেওয়ায়েতে হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) কিছু 'কুবা' (এক ধরনের পোশাক –অনুবাদক) বণ্টন করলেন এবং মাখরামাকে কোনো কুবা দিলেন না। মাখরামা তার ছেলেকে বললেন, হে আমার বৎস! আমাদের সাথে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে চলো। আমি তার সাথে গেলাম– তার ছেলে মিসওয়ার এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, ভেতরে যাও এবং তাঁকে আমার কাছে ডেকে আনো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ছোটো ছিলাম, ভেতরে গেলাম এবং তাঁকে ডেকে জানালাম যে, আমার বাবা এসেছেন। তিনি (সা.) তাদের কাছে আসলেন এবং সেই পোশাকগুলোর মধ্য থেকে একটি কুবা তাঁর হাতে ছিল। তিনি (সা.) বললেন, আমি এটি তোমার জন্য তুলে রেখেছিলাম। অর্থাৎ তুমি অভিযোগ নিয়ে এসেছিলে না? তিনি অভিযোগ প্রকাশ করার আগেই চাদরটি তাকে দিয়ে দিলেন যে, আমি এটি তোমার জন্য সযত্নে তুলে রেখেছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সেই মাখরামার দিকে তাকালেন এবং বললেন, এই চাদরটি তোমার জন্য। এতে মাখরামা আনন্দিত হয়ে গেলেন।

[সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৭৩৬]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত মাখরামার কণ্ঠস্বর চিনে ফেললেন এবং বাইরে চলে আসলেন। ছেলে ভেতরে যাবার পরিবর্তে তিনি (সা.) নিজেই বাইরে চলে আসলেন। তাঁর কাছে একটি কুবা ছিল, তিনি সেটির গুণাবলি বা সৌন্দর্য তাকে দেখাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, আমি এটি তোমার জন্যই তুলে রেখেছিলাম, আমি এটি তোমার জন্যই তুলে রেখেছিলাম।

[সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৭৩৭]

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে যাচ্ছিলাম, তিনি একটি নাজরানী চাদর জড়িয়ে রেখেছিলেন যার পাড় বা কিনারা খসখসে ছিল। এক বেদুইন ব্যক্তি এসে তাঁর সাথে দেখা করল এবং সে অত্যন্ত জোরে তাঁর চাদর ধরে টান দিল। আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘাড়ে একপাশে তাকালাম, অত্যন্ত জোরে টানার কারণে চাদরের কিনারার দাগ তাঁর ঘাড়ে বসে গিয়েছিল। তারপর সে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহর যে মাল আপনার কাছে আছে, তা থেকে আমাকেও দেবার আদেশ দিন। রসূলুল্লাহ (সা.) তার দিকে মনোযোগ দিলেন এবং হেসে দিলেন, তারপর তাকে দান করার নির্দেশ দিলেন। [সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৭৩৫]

এর বিস্তারিত বিবরণ অন্য এক স্থানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) আমাদের সাথে মজলিসে বসে কথাবার্তা বলতেন। তারপর তিনি যখন দাঁড়াতেন, আমরাও দাঁড়িয়ে যেতাম, যতক্ষণ না তিনি নিজের ঘরে চলে যেতেন। একদিন তিনি আমাদের সাথে কথা বলছিলেন, তাঁর দাঁড়ানোর সাথে সাথে আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। আমরা এক

বেদুইনকে দেখলাম যে তাঁকে ধরে তাঁর চাদরের সাহায্যে তাঁকে টানল। এতে তাঁর ঘাড় লাল হয়ে গেল। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.)-এর সেই চাদরটি খুবই খসখসে ছিল। তারপর মহানবী (সা.) যখন তার দিকে মুখ ফেরালেন তখন সেই বেদুইন তাঁকে বলল, আমার এই দুটি উটের ওপর আপনি মালামাল বোঝাই করে দিন, কারণ আপনি তো নিজের ধনসম্পদ থেকেও বোঝাই করে দেবেন না এবং আপনার বাবার ধনসম্পদ থেকেও দেবেন না। সে অত্যন্ত অভদ্রভাবে কথা বলল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী করীম (সা.) বললেন, না, আর আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি; না, আর আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি; না, আর আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তিনি ইস্তিগফারও করলেন এবং বললেন, না, আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দেবো না– এমনটি ছিল না যে, দেবেনই না, বরং এ শর্ত দিলেন যে– আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দেবো না যতক্ষণ না তুমি আমাকে এই টানার প্রতিশোধ দেবে। তুমি যে আমার চাদর টেনেছ এবং আমার ঘাড় জখম করেছ, তার বদলা দাও। সেই বেদুইন প্রতিবারই বলছিল, আল্লাহর কসম! আমি এর বদলা দেবো না। সে বলল, না, আমি কোনো বদলা দেবো না। সে বলল, কারণ আপনি মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে নেন না। সে এই কৌশল অবলম্বন করল, বেদুইনও চতুর ছিল যে, আপনি তো মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে নেন না, তাই আমি বদলা দেবো এমন প্রশ্নই ওঠে না। আমি তো মন্দ করেছি, আপনি তো মন্দ করবেন না। এটি শুনে নবী করীম (সা.) হেসে দিলেন, তারপর মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন, তার দুটি উটের একটির ওপর যব এবং অন্যটির ওপর খেজুর বোঝাই করে দাও; দুটিই পূর্ণ করে দাও। তিনি তাকে কেবল ধনসম্পদই দান করেন নি, বরং তার অন্যায় আচরণও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। [সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৪৭৭৫]

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, আমাদের কাছে যদি বাহরাইনের মালামাল আসে, তবে আমি তোমাকে এভাবে, এভাবে এবং এভাবে দেবো। তিনি দুই হাত একত্রিত করে অঞ্জলি ভরে ইশারা করে বলেছিলেন; কিন্তু বাহরাইনের ধনসম্পদ আসার পূর্বেই মহানবী (সা.)-এর ওফাত হয়ে যায়। পরবর্তীতে সেই ধনসম্পদ তাঁর পরে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে আসে। তিনি একজন ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলেন, মহানবী (সা.)-এর জিম্মায় যার কোনো প্রতিশ্রুতি বা ঋণ রয়েছে, সে যেন আসে। এটি শুনে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং নিবেদন করলাম, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, বাহরাইনের ধনসম্পদ যদি আসে, তবে আমি তোমাকে এভাবে, এভাবে এবং এভাবে দেবো। এরপর হযরত আবু বকর দুই হাত জোড় করে এক অঞ্জলি ভরে দিলেন। তারপর আমাকে বললেন, এটি গণনা করো। ফলশ্রুতিতে আমি গণনা করে দেখলাম তা পাঁচশ দিরহাম ছিল। তারপর তিনি বললেন, এর দ্বিগুণ আরো নিয়ে নাও। হযরত তালহা বিন হাযরামী, যাকে রসূলুল্লাহ (সা.) বাহরাইনের কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি বাহরাইন থেকে এই ধনসম্পদ পাঠিয়েছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর পরেও হযরত তালহা এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

[সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস-৪২৬৪]

হারূন বিন রিয়াব বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.)-এর কাছে সত্তর হাজার দিরহাম এলো। এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি পরিমাণ সম্পদ যা তাঁর কাছে এসেছিল। তারপর এই ধনসম্পদ একটি চাটাইয়ের ওপর রাখা হলো। এরপর তিনি (সা.) তা বণ্টন করার জন্য দাঁড়ালেন এবং যে যাচনাকারীই এলো, তাকে তিনি খালি হাতে ফিরিয়ে দিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি সেসব ধনসম্পদ বণ্টন করে দিলেন। [আখলাকুন নবী (সা.) ওয়া আদাবুহু, পৃ: ১০৩-১০৪]

এই রেওয়ায়েতে এমনটিই রয়েছে। তবে এর চেয়েও বেশি ধনসম্পদ অন্যান্য সময়ে আসতে থেকেছে। সম্ভবত বর্ণনাকারীর জ্ঞান অনুযায়ী এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি ধনসম্পদ, অথবা যে সময় এই বর্ণনাটি দেওয়া হচ্ছিল সে সময় পর্যন্ত এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি সম্পদ; কারণ এর পূর্বের যে বর্ণনাটি রয়েছে, তাতে বাহরাইন থেকে যে ধনসম্পদ এসেছিল তা এর চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে কিছু সাহায্য চাইল।মহানবী (সা.) তার জন্য ধার করে অর্ধ ওসক খাদ্যশস্য এনে দিলেন। এক ওসক প্রায় সাড়ে ষাট সা' সমান, আর এক সা' প্রায় আড়াই সেরের সমান। পরে যিনি ধার দিয়েছিলেন, তিনি পাওনা আদায় করতে এলেন। তখন মহানবী (সা.)তাকে এক পূর্ণ ওসক শস্য দিলেন এবং বললেন, "এর অর্ধেক তোমার ঋণ পরিশোধের জন্য, আর বাকি অর্ধেক তোমার জন্য উপহারস্বরূপ।" [আশশিফা তারিফি হাকুকিল মুস্তফা, পৃ: ৭৭-৭৮]

এটাই ঋণ পরিশোধের উত্তম পদ্ধতি। তিনি অর্ধ ওসক শস্য ধার নিয়েছিলেন, কিন্তু পরিশোধ করার সময় পুরো এক ওসক দিলেন। অর্থাৎ ঋণ ফেরত দেওয়ার সর্বোত্তম উপায় হলো কৃতজ্ঞতা ও উদারতার সঙ্গে তা পরিশোধ করা। আর এমন নয় যে আসল ঋণটুকুও ফেরত দিতে গড়িমসি ও টালবাহানা করা হবে।

হযরত সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত: মহানবী (সা.)-এর জন্য কালো রঙের একটি উলের জুব্বা তৈরি করা হয়েছিল। একদিন তিনি সেই জুব্বা পরে সাহাবিদের মাঝে বের হয়ে এলেন। তিনি (সা.) বললেন, "তোমরা কি দেখছ না, এটি কত সুন্দর?" একজন বেদুইন বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা-বাবা আপনার জন্য কোরবান হোক, এই জুব্বাটি আমাকে দান করুন।" মহানবী (সা.)-এর কাছে কখনো কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করতেন না। তাই তিনি নিজের জুব্বাটি খুলে সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন।[সুবুলুলহুদা ওয়ার রাশাদ, খণ্ড-৭, পৃ: ৫৩]

আরেকটি অত্যন্ত সুন্দর ঘটনা।হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বর্ণনা করেন: মহানবী (সা.) একজন কাপড় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চার দিরহাম দিয়ে একটি জামা কিনলেন। সেই জামাটি পরে তিনি (সা.) বাইরে বের হলেন। তখন আনসারদের একজন বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এই জামাটি পরিয়ে দিন। আল্লাহ আপনাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দিন।" মহানবী (সা.) সঙ্গে সঙ্গে জামাটি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। এরপর তিনি আবার দোকানদারের কাছে গেলেন এবং আরও চার দিরহাম দিয়ে আরেকটি জামা কিনলেন। তাঁর (সা.) কাছে তখন মোট দশ দিরহাম ছিল। প্রথম জামাটি চার দিরহামে কিনেছিলেন, পরে দ্বিতীয় জামাটিও চার দিরহামে কিনলেন। ফলে তাঁর কাছে দুই দিরহাম অবশিষ্ট রইল। ফিরে আসার পথে তিনি (সা.) এক দাসী মেয়েকে কাঁদতে দেখলেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কেন কাঁদছ?" মেয়েটি বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাড়ির লোকেরা আমাকে দুই দিরহাম দিয়েছিল আটা কিনে আনার জন্য। কিন্তু সেই টাকা হারিয়ে গেছে।" তখন মহানবী (সা.) নিজের কাছে থাকা শেষ দুই দিরহামও তাকে দিয়ে দিলেন। মেয়েটি টাকা পাওয়ার পরও আবার কাঁদতে লাগল। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কেন কাঁদছ? তোমার তো ২ টাকা হয়ে গেছে, যাও আটা কিনে নিয়ে যাও।" সে বলল, "আমার ভয় হচ্ছে, এত দেরি হওয়ার কারণে বাড়ির লোকেরা আমাকে মারবে।" তখন মহানবী (সা.) নিজেই তার সঙ্গে তার বাড়ির দিকে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি সালাম দিলেন। কিন্তু বাড়ির লোকেরা তাঁর কণ্ঠস্বর চিনলেও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। তিনি দ্বিতীয়বার সালাম দিলেন, তবুও তারা নীরব রইল। তিনি তৃতীয়বার সালাম দিলেন। তখন তারা সালামের জবাব দিল। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি প্রথমবার সালাম শুনতে পাও নি?" তারা বলল, "জী, আমরা শুনেছিলাম। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম আপনি বারবার আমাদের জন্য সালামের দোয়া করুন, তাই জবাব দিতে দেরি করেছি।" এটাই ছিল সাহাবিদের আগ্রহ ও নিষ্ঠা। এরপর তারা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মা-বাবা আপনার জন্য কোরবান হোক। আপনি কী কারণে এখানে এসেছেন?" মহানবী (সা.) বললেন, "এই মেয়েটি ভয় পাচ্ছিল যে তোমরা তাকে মারবে।" তখন সেই দাসী মেয়ের মালিক বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার সঙ্গে এসেছেন– এই সম্মানের কারণে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই দাসীকে মুক্ত করে দিলাম।" তখন নবী করিম (সা.) তাদের জন্য কল্যাণ ও জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন এবং বললেন:

আল্লাহ্ তা'লা এই দশ দিরহামের মধ্যে এত বরকত দান করেছেন যে, এর মাধ্যমে তাঁর নবীকেও তিনি জামা পরিধান করিয়েছেন, একজন আনসার সাহাবীকেও জামা পরিধান করিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে একজন দাসীকেও মুক্ত করিয়েছেন।

[আল মুজামুল কাবীর লিত তিবরানী, খণ্ড-১২, পৃ: ৪৪১-৪৪২]

হযরত উসমান (রা.) নবী করীম (সা.)-কে উপহারস্বরূপ এক ছড়া আঙুর পেশ করেন এবং এটাও বর্ণনা করা হয় যে, সেটি এক ছড়া খেজুর ছিল। প্রথমে এক জায়গায় আঙুর এর কথা এসেছে আবার আরেক স্থানে খেজুর রয়েছে–যাই হোক, বলা হয় যে এরপর একজন সাহায্যপ্রার্থী এলো, তখন নবী করীম (সা.) সেটি তাকে দিয়ে দিলেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) সেই সাহায্যপ্রার্থীর কাছ থেকে তা এক দিরহাম দিয়ে কিনে নিলেন। যে ছড়াটি আপনি তিনি (রা.) এনেছিলেন, সেটি হয়ত কোনো বিশেষ জাতের হবে বা খেজুরগুলো ভালো ছিল। তিনি (রা.) তার কাছ থেকে এক দিরহাম দিয়ে কিনে সেটি পুনরায় মহানবী (সা.)-এর খিদমতে পেশ করলেন।এরপর সেই সাহায্যপ্রার্থী আবার চলে এলো, তখন তিনি (সা.) তাকে আবার সেটি দিয়ে দিলেন। আর এভাবে এই ঘটনা তিনবার ঘটল। হযরত উসমান (রা.) কিনে নিতেন এবং মহানবী

## সমস্ত উন্নতি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছেন, "তোমরা ভালভাবে স্মরণ রাখবে, তোমাদের সমস্ত উন্নতি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যেদিন তোমরা এ কথা বুঝতে অক্ষম হবে এবং খিলাফতকে কায়েম রাখবে না, সেদিন তোমাদের ধ্বংস ও সর্বনাশের দিন হবে। আর যদি তোমরা এ সত্যকে অনুধাবন কর এবং খিলাফতের এ নেয়ামকে কায়েম রাখ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী যদি সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, তবুও তারা তা পারবে না। তোমাদের বিপরীতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে থাকবে। যতদিন তোমরা একে (নেয়ামে খিলাফতকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ততদিন পৃথিবীর কোন বিরোধিতাই কার্যকর হবে না।" (দরসে কুরআন, পৃ. ৭৩, প্রকাশিত ১৯২১)

(সা.)-এর খিদমতে পেশ করতেন, আর সে সাহায্যপ্রার্থী এসে আবার চাইত আর তিনি (সা.) তাকে তা দিয়ে দিতেন। অবশেষে নবী করীম (সা.) অত্যন্ত নরম সুরে সেই সাহায্যপ্রার্থীকে বললেন, 'হে অমুক! তুমি সাহায্যপ্রার্থী নাকি ব্যবসায়ী? তুমি তো চাইতে এসেছ, সাহায্যপ্রার্থীরা তো এমন করে না; তুমি তো দিরহামও কামিয়ে যাচ্ছো আর এদিকে ব্যাবসাও করছ।' [তফসীর রুহুল মাআনি, সূরা জহা-র তফসীর, খণ্ড-১৫, ভাগ; ২৯-৩০, পৃ: ৩৭৬]

তিনি (সা.) তাকে ,

ফিরিয়ে দেননি, বরং অত্যন্ত প্রাজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে নসিহত করলেন যে, তুমি যা করছ এই কাজটি উপযুক্ত নয়।হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.) বর্ণনা করেন যে, যখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'লা যায়েদ বিন সা'নাহ-কে হিদায়াত দিতে চাইলেন, তখন যায়েদ বিন সা'নাহ বললেন, নবুওয়তের যতগুলো আলামত বা লক্ষণ ছিল, তার সবগুলোই আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র চেহারায় দেখতে পেয়েছিলাম-কেবল দুটি বিষয় ছাড়া, যা আমি বুঝতে পারিনি যে তা তাঁর (সা.) মধ্যে আছে কি না। তার মধ্যে একটি হলো-এই নবীর ধৈর্য ও সহনশীলতা তাঁর রাগের ওপর প্রবল থাকবে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো-তাঁর সাথে যতই মূর্খতাসুলভ (অসভ্য) আচরণ করা হবে, তিনি ধৈর্য ও ভদ্রতায় ততই বৃদ্ধি পাবেন। আর আমি সেই সুযোগেই ছিলাম যে, কোনো সুযোগ পেলে এই আলামত দুটিও পরীক্ষা করে দেখব। যাইহোক, পরীক্ষা করার বিষয় তো আলাদা ছিল, কিন্তু সুযোগটি এভাবে তৈরি হলো যে-যায়েদ বিন সা'নাহ বলেন, একদিন মহানবী (সা.) ঘর থেকে বাইরে এলেন, তাঁর সাথে আলী বিন আবি তালিব (রা.) ছিলেন। এমন সময় একজন আরোহী এলো যাকে বেদুইন অর্থাৎ গ্রাম্য মনে হচ্ছিল। সে বলতে লাগল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক বংশের বুসরা গ্রামের মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে। আর আমি তাদের বলেছিলাম যে, তারা যদি মুসলমান হয় তবে প্রচুর রিজিক পাবে। এখন তারা অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ ও খরার সম্মুখীন হয়েছে। হে আল্লাহর রসূল! আমার ভয় হচ্ছে তারা যেন আবার লোভ ও লালসার বশে ইসলাম থেকে বেরিয়ে না যায়, যেভাবে তারা রিজিকের প্রাচুর্যের লোভে মুসলমান হয়েছিল। আপনি যদি দয়া করেন এবং উপযুক্ত মনে করেন, তবে তাদের কাছে কিছু পাঠিয়ে তাদের সাহায্য এবং সান্ত্বনা প্রদান করুন।'

নবী করীম (সা.) সেই লোকটির দিকে তাকালেন। তাঁর সাথে হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন, তিনি বললেন, এই মুহূর্তে তো এমন কোনো জিনিস নেই যা সাহায্যের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পাঠানো যেতে পারে।যায়েদ বিন সা'নাহ বলেন, আমি তাঁর কাছে গেলাম (আমি লক্ষ্য করছিলাম, আমি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম) এবং বললাম, 'হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কি অমুক বংশের বাগানের খেজুর একটি নির্ধারিত পরিমাণ এবং নির্ধারিত মেয়াদের শর্তে বিক্রি করতে পারেন?' নবী করীম (সা.) বললেন, 'হে ইহুদি! এই সা'নাহ ইহুদি ছিলেন, নির্ধারিত পরিমাণ এবং মেয়াদের শর্তে তো আমি খেজুর বিক্রি করতে পারি, কিন্তু আমি এই শর্ত মানতে পারব না যে, এই খেজুর অমুক বংশের অমুকের বাগানেরই হতে হবে।' আমি বললাম, ঠিক আছে। অতএব তিনি (সা.) আমার সাথে চুক্তি করলেন। আমি আমার থলে খুললাম এবং তাঁকে (সা.) অগ্রিম হিসেবে এত মিহকাল সোনা দিয়ে দিলাম যে, অমুক সময়ে আপনি আমাকে এত পরিমাণ খেজুর দিয়ে দেবেন। এক মিহকাল প্রায় সোয়া চার গ্রামের সমান হয়। মহানবী(সা.) সেই স্বর্ণালংকারটি সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দেন, যে সাহায্যের জন্য এসেছিল এবং (তাকে) বলেন: এগুলো বিপদগ্রস্ত মানুষের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দাও এবং তাদের মাধ্যমে ও এর মাধ্যমে তাদের সাহায্য করো। হযরত যায়েদ বিন সা'নাহ (রা.) বলেন, নির্ধারিত সময়সীমার এখনো দুই-তিন দিন বাকি ছিল, এমন সময় আমি তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হই এবং তাঁর (সা.) জামার কলার ধরে এবং চাদর টেনে ধরে খুব রাগত স্বরে বলি: হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কি আমার হক বা অধিকার আদায় করবেন না? আল্লাহর কসম! আমি বনু আব্দুল মুত্তালিবের এই অভ্যাস ভালো করেই জানি যে, তারা ঋণ পরিশোধে খুব খারাপ, আর আপনাদের টালবাহানার অভ্যাস সম্পর্কেও আমি জানি; যদিও এই প্রশ্নই ওঠে না। যাহোক, তখন শত্রু ছিলাম, তখন তো মনে শত্রুতা ছিল অথবা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম; সুতরাং সে এমনটিই করে। আর আমার এর অভিজ্ঞতা আছে; সে এ-কথা বলে। তিনি বলেন, সে-সময় আমি উমর (রা.)-কে দেখছিলাম, যিনি পাশেই ছিলেন। রাগের কারণে তাঁর চোখ এমনভাবে ঘুরছিল, যেভাবে ঘোরানো চরকা ঘোরে। তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) খুব রাগের সাথে, বড়ো বড়ো চোখে আমার দিকে তাকান এবং বলেন: হে আল্লাহর শত্রু! তুমি আল্লাহর রসুল (সা.)-কে এমন কথা বলছ যা আমি শুনছি, আর এমন বেয়াদবির সাথে আচরণ করছ যা আমি দেখছি। সেই খোদার কসম! যিনি তাঁকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, যদি তাঁর ভয় না থাকত, তবে আমি আমার তলোয়ার দিয়ে তোমার মাথা উড়িয়ে দিতাম। অথচ রসূলুল্লাহ (সা.) খুব শান্ত ও স্বস্তির সাথে উমরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং মুচকি হাসছিলেন। এরপর বলেন; অতঃপর তিনি (সা.) বলেন: হে উমর! এই রাগের পরিবর্তে আমি এবং সে, আমরা দুজন এর বেশি হকদার যে, তুমি আমাকে উত্তমভাবে পরিশোধের জন্য এবং তাকে উত্তমভাবে তাগাদা করার জন্য বলবে। হে উমর! তাকে নিয়ে যাও এবং তাকে তার হক দিয়ে দাও, বরং বিশ সা' বেশি খেজুরও দিয়ে দিও। আমি বললাম: হে উমর! এই অতিরিক্ত কিসের জন্য? তিনি জবাব দেন: মহানবী (সা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি তোমার সাথে যে কঠোরতা করেছি, তার বদলে যেন তোমাকে বেশি আদায় করি। আমি উমরকে বললাম: আপনি কি জানেন আমি কে? উমর বললেন: না! আপনি কে? আমি বললাম: আমি যায়েদ বিন সা'নাহ। উমর জিজ্ঞেস করেন: সেই হিবর, অর্থাৎ ইহুদীদের বড়ো আলেম? আমি জবাব দিলাম: হ্যাঁ, ইহুদীদের আলেম। এতে উমর (রা.) বলেন: এতো বড়ো আলেম হয়ে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বেয়াদবির এই পন্থা তুমি কেন অবলম্বন করলে? আমি জবাব দিলাম: হে উমর! নবুওয়াতের যত লক্ষণ ছিল, যখন আমি তাঁকে (সা.) দেখলাম তখন তা তাঁর মাঝে দেখতে পেয়েছি, শুধু দুটি নিদর্শন ছাড়া- যেগুলো সম্পর্কে আমি জানতাম না। প্রথমত, এই নবীর সহিষ্ণুতা কি তাঁর রাগের ওপর প্রাধান্য পায়? দ্বিতীয়ত, যত বেশি তাঁর সাথে কঠোরতা ও অজ্ঞতার আচরণ করা হয়, তিনি তত বেশি ধৈর্য ও সহনশীলতার আচরণ করবেন। তাই আমি এই দুটি বিষয় যাচাই-বাছাই করেছি। হে উমর! আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি আল্লাহকে আমার প্রভু-প্রতিপালক, ইসলামকে আমার ধর্ম, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আমার নবী হিসেবে গ্রহণ করায় সন্তুষ্ট। আর আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমার অর্ধেক সম্পদ- কেননা আমি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি- উম্মতে মুহাম্মদির জন্য সদকা (উৎসর্গ) করছি। এতে উমর (রা.) বলেন: উম্মতে মুহাম্মদিয়ার কিছু লোকের জন্যও বলো, কারণ পুরো উম্মতের তো কোনো হিসেবই নেই; তাদের জন্য এই অর্থসম্পদ কীভাবে পূর্ণ হতে পারে? আমি বললাম:

আচ্ছা, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের জন্যও সদকা আছে। অতঃপর যায়েদ মহানবী (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। আমি এর প্রতি ঈমান আনয়ন করছি। এভাবে যায়েদ মহানবী (সা.)-এর সত্যতা স্বীকার করেন এবং বয়আত করেন আর বহু যুদ্ধে তাঁর (সা.) সাথে অংশগ্রহণ করেন; এমনকি গাযওয়ায়ে তাবুক থেকে ফেরার পথেই যায়েদের (রা.) ওফাত (মৃত্যু) হয়।

[আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, লিল হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩২৮-৩২৯]

ইহুদী আলেম ছিলেন, তাঁর ফিতরত বা স্বভাব-চরিত্র নেক ছিল এবং তাঁকে (সা.) দেখে, সকল লক্ষণ দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন।এই হলো মহানবী (সা.)-এর উত্তম চরিত্র, কেননা শুধুমাত্র ঋণ নিয়ে একটি জাতিকে ক্ষুধা থেকেই মুক্তি দেন নি, বরং তাঁর (সা.) আখলাকের (অনুপম আদর্শের) মাধ্যমে একজন ইহুদী আলেমকেও মুসলমান বানিয়ে নেন।

## আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

## দুইশতবার দরুদ শরীফ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ اٰلِ مُحَمَّدٍ

**অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।**

**(Holy is Allah and worthy of all praise. Holy is Allah,the Great. O Allah! bestow Your blessings on Muhammadsa and on the people of Muhammad sa.)**

**একশতবার 'আসতাগফিরুল্লাহ্'**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

**অনুবাদ: আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।**

**নিম্নোক্ত দোয়াটি একশতবার**

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

**অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।**

**(O my Lord! Everything serves You. So, O my Lord, protect me and help me and have mercy on me.)**

## হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অস্ট্রেলিয়া সফর (২০১৩)

### ১৬ অক্টোবর, বুধবার, ২০১৩

### গেস্ট হাউসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান

আজকের কর্মসূচি অনুযায়ী গেস্ট হাউসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই গেস্ট হাউসটি দুইতলা বিশিষ্ট এবং মসজিদ বায়তুল হুদা-এর বাইরের প্রাঙ্গণের একাংশে নির্মাণ করা হচ্ছে।

সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। জামাআতের পুরুষ ও মহিলা সদস্যবৃন্দ পূর্ব থেকেই বিপুল সংখ্যায় সেখানে সমবেত ছিলেন।

অনুষ্ঠান পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। তিলাওয়াত করেন অস্ট্রেলিয়ার মুকাররম ইমতিয়াজ আহমদ সাহেব, মুবাল্লিগ সিলসিলা।

এরপর হুযূর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) প্রথম ইট স্থাপন করেন। পরে হযরত বেগম সাহেবা (মাদ্দাযিল্লাহাল আলাইহা) দ্বিতীয় ইট স্থাপন করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ একটি করে ইট স্থাপনের সৌভাগ্য লাভ করেন-

* মুকাররম মাহমুদ আহমদ সাহেব, আমীর ও মুবাল্লিগ-ইনচার্জ, অস্ট্রেলিয়া
* আবদুল মাজিদ তাহির সাহেব (অ্যাডিশনাল ওকিলুত-তাবশীর, লন্ডন)
* মুনীর আহমদ জাভেদ সাহেব (প্রাইভেট সেক্রেটারি)
* মুবারক আহমদ জাফর সাহেব (অ্যাডিশনাল ওকিলুল মাল, লন্ডন)
* চৌধুরী খালিদ সাইফুল্লাহ খান সাহেব (নায়েবে আমীর, অস্ট্রেলিয়া)
* নাসির মাহমুদ কাহলুঁ সাহেব (নায়েবে আমীর, অস্ট্রেলিয়া)
* আজিজ উদ্দীন সাহেব (অস্ট্রেলিয়ার প্রথম মজলিসে আমেলার সদস্য)
* রানা মুহাম্মদ আমজাদ খান সাহেব (অস্ট্রেলিয়ার প্রথম মজলিসে আমেলার সদস্য)
* মুহাম্মদ আমজাদ খান সাহেব (সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ)
* মিসেস আঞ্জুম খান সাহেবা (সদর, লাজনা ইমাঈল্লাহ অস্ট্রেলিয়া)
* এজাজ আহমদ রানা সাহেব (সদর, মজলিস খুদ্দামুল আহমদিয়া)
* মুকাররম ইউসুফ আব্বাসী সাহেব (সদর, মজলিস কাজা বোর্ড)
* আযহার রাইহান খান সাহেব (প্রেসিডেন্ট, আহমদিয়া আর্কিটেক্টস অ্যাসোসিয়েশন)
* মুহাম্মদ সরওয়ার শাহ সাহেব (ন্যাশনাল সেক্রেটারি, জিয়াফত)
* ফিরোজ আলী শাহ সাহেব (ন্যাশনাল সেক্রেটারি, জায়েদাদ)
* মুহাম্মদ উসমান খান সাহেব (ন্যাশনাল সেক্রেটারি, মাল)
* মুহাম্মদ খলিল শেখ সাহেব (ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি)

দুইজন ওয়াকফে নও শিশু-প্রিয় আবদুল আহমদ এবং প্রিয় মাহীন আশফাক-প্রত্যেকেই একটি করে ইট স্থাপনের সৌভাগ্য লাভ করে।

সবশেষে হুযূর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) দোয়া পরিচালনা করেন।

পরবর্তীতে হুযূর আনওয়ার গেস্ট হাউসের নির্মাণ-সংক্রান্ত নকশা পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে চান। এই প্রশস্ত গেস্ট হাউসটি দুইতলা বিশিষ্ট এবং এর নির্মাণকারী দল তরুণ আহমদি প্রকৌশলী ও স্থপতিদের সমন্বয়ে গঠিত।

অনুষ্ঠানের পর হুযূর আনওয়ার কিছু সময়ের জন্য সৈয়দ সবীহ আহমদ সাহেব, ডা. তাসীর মুজতবা সাহেব (ওয়াকফে জীবন)-এর পুত্রের বাসভবনে গমন করেন এবং রাত ৮টায় ফিরে আসেন।

এরপর হুযূর আনওয়ার মসজিদ বায়তুল হুদা-য় গিয়ে মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করান। নামাজ শেষে তিনি তাঁর আবাসস্থলে ফিরে যান।

### ১৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ২০১৩

ভোর ৫টা ১০ মিনিটে হুযূর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) মসজিদ বায়তুল হুদা-য় উপস্থিত হয়ে ফজরের নামাজে ইমামতি করেন। নামাজ শেষে তিনি তাঁর আবাসস্থলে ফিরে যান।

সকালে হুযূর আনওয়ার দাপ্তরিক ডাক, বিভিন্ন রিপোর্ট এবং বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ফ্যাক্স ও রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

দুপুর দেড়টায় তিনি মসজিদ বায়তুল হুদা-য় গিয়ে যোহর ও আসরের নামাজ একত্রে আদায় করান। নামাজ শেষে তিনি পুনরায় আবাসস্থলে ফিরে যান।

কর্মসূচি অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর আনওয়ার তাঁর দপ্তরে আসেন।

### অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় টেলিভিশনের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় টেলিভিশন ABC (Newsline)-এর প্রতিনিধি পূর্ব থেকেই হুযূর আনওয়ারের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

TNewsline অস্ট্রেলিয়ার টেলিভিশনের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এর গুরুত্ব এ থেকেই বোঝা যায় যে, এটি বিশ্বের ৪৬টি দেশে প্রচারিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়া সফর করলে তাঁদের সাক্ষাৎকারও এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয় এবং এটি বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়।

সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে সাক্ষাৎকার শুরু হয়।

প্রশ্ন: হুযূরের অস্ট্রেলিয়া সফরের উদ্দেশ্য কী?

উত্তরে হুযূর আনওয়ার বলেন: আমি যে দেশেই যাই, আমার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে আমাদের কমিউনিটির সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, তাঁদের সমস্যাগুলো শোনা, তাঁদের অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং তাঁদের দিকনির্দেশনা প্রদান করা। এরপর আমার জুমার খুতবা ও অন্যান্য ভাষণের মাধ্যমে তাঁদের আধ্যাত্মিক মান উন্নত করা এবং নেক কাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের কমিউনিটি খুব বড় নয়। সদস্যসংখ্যা চার হাজারেরও বেশি এবং তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে আগতদের অধিকাংশই পাকিস্তান থেকে এসেছেন। তাঁরা পাকিস্তান ত্যাগ করেছেন, কারণ সেখানে তাঁরা নির্যাতনের শিকার এবং তাঁদের মৌলিক ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই কারণেই তাঁরা দেশত্যাগ করছেন। তিনি আরও বলেন, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর আহমদিরাও এখানে এসেছেন, তবে পাকিস্তান থেকে আগতদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

প্রশ্ন: আপনাদের সঙ্গে অন্যান্য মুসলমানদের পার্থক্য কী?

হুযূর আনওয়ার বলেন:মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের কেবল নামটুকুই অবশিষ্ট থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা একজন সংস্কারক (রিফর্মার) প্রেরণ করবেন, যিনি মসীহ ও মাহদির উপাধি ধারণ করবেন এবং মানুষকে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করবেন ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করবেন।

আমাদের বিশ্বাস, মসীহ (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমন এই সংস্কারকের আগমনের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়েছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর মাধ্যমে সেই সংস্কারক আগমন করেছেন। অন্য মুসলমানরা বলেন, তিনি এখনও আগমন করেননি।

আমরা বলি, মহানবী (সা.) তাঁর আগমনের অনেক নিদর্শন বর্ণনা করেছিলেন। তার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ছিল-তিনি যখন নিজেকে মসীহ ও মাহদি বলে দাবি করবেন, তখন তাঁর সত্যতার সমর্থনে রমজান মাসে নির্ধারিত তারিখে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হবে। তাঁর দাবির পর এই নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে এবং তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে। এখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাহায্য করছেন এবং আহমদিয়া জামাআত দিনরাত বৃদ্ধি পাচ্ছে ও সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হয়েছে।

হুযূর আরও বলেন, অন্য মুসলমানরা মনে করেন যে মহানবী (সা.)-এর পরে আর কোনো নবী আসতে পারেন না। আমরা বলি, নতুন শরিয়তপ্রাপ্ত কোনো নবী আসবেন না, তবে শরিয়তবিহীন নবী আসতে পারেন।

তাঁরা আরও বলেন, ঈসা (আ.) যখন অবতরণ করবেন, তখন তিনি নবী হিসেবেই আসবেন। যদি ঈসা (আ.)-এর নবী হিসেবে আগমনে খাতমে নবুওয়াতের মর্যাদা ক্ষুন্ন না হয়, তবে মহানবী (সা.)-এর উম্মতের মধ্য থেকে নতুন শরিয়ত ছাড়া কোনো নবী আগমনে তা কীভাবে ক্ষুন্ন হতে পারে?

আরেক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর বলেন, ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান সরকার "For the Purpose of Law and Constitution" আমাদের অমুসলিম ঘোষণা করে। অথচ পৃথিবীর কোনো রাজনৈতিক দল বা সরকার কারও ধর্ম নির্ধারণ করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষ তার ধর্ম ও বিশ্বাস নির্ধারণে স্বাধীন।

ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ইন্দোনেশিয়ার সরকার কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করে না। তবে প্রতিটি সরকারের দায়িত্ব হলো, তাদের দেশের সকল নাগরিককে-তাদের ধর্ম বা সম্প্রদায় যাই হোক না কেন-নিরাপত্তা প্রদান করা এবং সকলের সঙ্গে ন্যায় ও সুবিচার করা।

আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাই। আমাদের মূলনীতি হলো-"সবার জন্য ভালোবাসা, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়" (Love for All, Hatred for None)। ধর্মীয়, রাজনৈতিক কিংবা অন্য যেকোনো সংগঠনই হোক, সর্বত্র আমাদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং গ্রহণ করা হয়। কারণ আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ এবং সমাজে শান্তি, সহনশীলতা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করি।

সিরিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের উচিত আলোচনা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা এবং শান্তিপূর্ণ ও সভ্য পন্থা অবলম্বন করা। যদি সরকার শুরু থেকেই জনগণের অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করত, তবে এসব সমস্যা

শেষাংশ ১২ পাতায়......

# সীরাত খাতামান নাবীঈন

*-মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.(রা.)*

## দুগ্ধপান ও শৈশবকাল

হালিমা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং গোত্রের সকল লোকও তাঁকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখত। কিন্তু যখন তাঁর বয়স চার বছর হলো, তখন এমন একটি ঘটনা ঘটল যার ফলে হালিমা ভীত হয়ে পড়লেন এবং তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে এনে তাঁর মাতা আমিনার জিম্মায় অর্পণ করলেন।

ইতিহাসে এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন তিনি তাঁর দুধ-ভাইয়ের সঙ্গে খেলছিলেন এবং আশেপাশে কোনো বড় মানুষ উপস্থিত ছিল না। এমন সময় হঠাৎ দুজন সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি দেখা দিল। তারা তাঁকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিল এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করল। এই দৃশ্য দেখে তাঁর দুধ-ভাই আবদুল্লাহ ইবন হারিস দৌড়ে গিয়ে তার মা-বাবাকে খবর দিল, "আমার কুরাইশি ভাইকে দুজন লোক ধরে ফেলেছে এবং তার বুক চিরে ফেলছে।"

হারিস ও হালিমা এ কথা শুনেই দ্রুত সেখানে ছুটে এলেন। এসে দেখলেন, সেখানে আর কোনো লোক নেই; কিন্তু মহানবী (সা.) ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর মুখমণ্ডলের রঙ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। হালিমা এগিয়ে এসে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, কী হয়েছে?"মহানবী (সা.) সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে, তারা আমার বুকের ভেতরে কোনো একটি জিনিস খুঁজছিল। সেটি বের করে তারা ফেলে দিয়েছে।

এরপর হালিমা ও হারিস তাঁকে নিজেদের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। হারিস হালিমাকে বললেন, "আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এই ছেলেটির কিছু একটা হয়েছে। তাই তুমি একে অবিলম্বে নিয়ে গিয়ে তার মায়ের জিম্মায় দিয়ে আসো।"

অতঃপর হালিমা তাঁকে নিয়ে মক্কায় এলেন এবং আমিনার কাছে সমর্পণ করলেন। আমিনা এত তাড়াহুড়ো করে ফিরিয়ে আনার কারণ জানতে চাইলেন। তিনি বারবার জিজ্ঞেস করলে হালিমা পুরো ঘটনা খুলে বললেন এবং এই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, হয়তো ছেলেটি কোনো জিন বা এ ধরনের অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে পড়েছে।

আমিনা বললেন, "এমনটি কখনোই হতে পারে না। আমার পুত্রের মর্যাদা অত্যন্ত মহান। যখন সে আমার গর্ভে ছিল, তখন আমি দেখেছিলাম যে, আমার ভেতর থেকে একটি নূর বের হয়েছে, যা বহু দূরবর্তী দেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।"

এই ঘটনার সামগ্রিক সমর্থন সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায়। সেখানে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে, একবার মহানবী (সা.) কয়েকজন শিশুর সঙ্গে খেলছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাইল (আ.) তাঁর কাছে আসেন। তিনি তাঁকে মাটিতে শুইয়ে তাঁর বুক বিদীর্ণ করেন। এরপর তাঁর বুকের ভেতর থেকে তাঁর হৃদয় বের করেন এবং তা থেকে একটি বস্তু বের করে বাইরে ফেলে দেন। একই সঙ্গে বলেন, "এটি ছিল দুর্বলতার ময়লা, যা এখন তোমার থেকে পৃথক করে দেওয়া হলো।"

এরপর জিবরাইল (আ.) তাঁর হৃদয় বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে আবার বুকে স্থাপন করলেন এবং বুক জোড়া লাগিয়ে দিলেন। যখন অন্যান্য শিশুরা দেখল যে, জিবরাইল (আ.) তাঁকে মাটিতে শুইয়ে তাঁর বুক বিদীর্ণ করছেন, তখন তারা ভয়ে দৌড়ে তাঁর দুধমায়ের কাছে গিয়ে বলল, "মুহাম্মদকে কেউ হত্যা করেছে।"

যখন তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছাল, তখন ফেরেশতা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।[৪]

সহীহ মুসলিমের এই বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হওয়ার পর ইবনে হিশামের বর্ণনাটি এমন শক্তি অর্জন করে যে, কোনো শক্তিশালী প্রমাণ ছাড়া একে দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তবে স্পষ্টতই এই ঘটনাটি ছিল একটি কাশফী দর্শন।[৫]

এ কারণে বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার কোনো বাহ্যিক চিহ্ন পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, সে সময় তাঁর দুধমা বা অন্য কেউ এর কোনো দৃশ্যমান লক্ষণ দেখেননি। এটিও প্রমাণ করে যে, এটি ছিল একটি কাশফ, যার প্রভাব অন্যান্য শিশুদের কাছেও বিস্তৃত হয়েছিল। এবং এই কাশফের মধ্যেই যেমন স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা মানবরূপ ধারণ করে কাশফের জগতে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করেছিলেন এবং তাঁর ভেতর থেকে সকল দুর্বলতার ময়লা বের করে দিয়েছিলেন।


### মহান আল্লাহ্‌র বাণী

**হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)**

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad


সহীহ হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, মিরাজের রাতেও মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে একই ধরনের বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। ফেরেশতারা তাঁর হৃদয় বের করে জমজমের বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে আবার যথাস্থানে স্থাপন করেছিলেন।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা অনুচিত হবে না। স্যার উইলিয়াম মিউর এই ঘটনার উল্লেখ করে বিদ্রূপের সুরে মন্তব্য করেছেন যে, নাউযুবিল্লাহ, এটি নাকি মহানবী (সা.)-এর মৃগীরোগের একটি আক্রমণ ছিল।

আমরা কারও বক্তব্য প্রকাশে বাধা দিতে পারি না, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই মিউর সাহেব এই আপত্তি উত্থাপন করতে গিয়ে চরম পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ প্রথমত, সকলেই জানে যে, মৃগীরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণত দুর্বল মস্তিষ্কের অধিকারী হন। অথচ মহানবী (সা.) সম্পর্কে স্বয়ং মিউর সাহেবই স্বীকার করেছেন যে, তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন।

তদুপরি, যে বর্ণনার ভিত্তিতে এই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেই বর্ণনাই এই আপত্তির খণ্ডন করে। কারণ বর্ণনাগুলোতে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, এই দৃশ্য মহানবী (সা.)-এর দুধ-ভাইও দেখেছিলেন এবং তিনিই দৌড়ে গিয়ে তাঁর মা-বাবাকে জানিয়েছিলেন যে, "আমার কুরাইশি ভাইকে দুজন সাদা পোশাকধারী ব্যক্তি মাটিতে ফেলে তার বুক বিদীর্ণ করছে।"

পৃথিবীতে এমন কোনো মৃগীরোগ কি আছে, যার সম্পর্কে অন্য লোকেরাও এ ধরনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার সাক্ষ্য দেয়?

হ্যাঁ, যিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হন, তিনি নিজের ধারণায় মনে করতে পারেন যে, কেউ তাঁকে ধরে মাটিতে আছাড় মেরেছে। কিন্তু যারা তাঁকে দেখছেন, তারাও যদি একই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন-এমন কথা কেবল একজন চরম পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ মুখে আনতে পারে না।

যাই হোক, যখন মহানবী (সা.)-এর বয়স চার বছর হলো, তখন হালিমা (রা.) তাঁকে ফিরিয়ে এনে তাঁর মাতা আমিনার জিম্মায় অর্পণ করলেন।

এই চার বছরের সেবা হালিমা (রা.)-এর কোনো সাধারণ সেবা ছিল না। আর মহানবী (সা.) তো সামান্যতম উপকারও কখনো বিস্মৃত হতেন না। তাই তিনি সারাজীবন হালিমা (রা.)-এর এই সেবার কথা স্মরণ রেখেছিলেন এবং সর্বদা তাঁর প্রতি অত্যন্ত উত্তম আচরণ করতেন।

একবার দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হালিমা (রা.) মক্কায় এলেন। তখন মহানবী (সা.) তাঁকে চল্লিশটি ছাগল এবং একটি উট দান করেছিলেন।

নবুয়তের যুগে একবার তিনি আবার তাঁর কাছে এলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে দেখামাত্রই "আমার মা! আমার মা!"বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের গায়ের চাদর খুলে তাঁর বসার জন্য বিছিয়ে দিলেন।

পরে এক যুদ্ধে (অর্থাৎ হুনাইনের যুদ্ধে) হাওয়াযিন গোত্রের হাজার হাজার বন্দীকে আনা হলে, মহানবী (সা.) এই আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তাদের সকলকে মুক্ত করে দেন এবং সেই বন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে একটি পয়সাও গ্রহণ করেননি।[১]

এছাড়া তাঁর এক দুধ-বোন, যিনি সেই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন, তাঁকেও প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করে বিদায় করেছিলেন।

হালিমা (রা.) এবং তাঁর স্বামী হারিস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কি না-এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো, তাঁরা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলিম অবস্থায়ই ইন্তেকাল করেছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর দুধ-ভাই আবদুল্লাহ এবং দুধ-বোন শাইমাও ইসলাম গ্রহণের পরই ইন্তেকাল করেছিলেন।

---

১: এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, হালিমা ও হারিস সেখানে কোনো রক্তপাতের চিহ্ন দেখেননি। বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ারও কোনো বাহ্যিক লক্ষণ তাঁরা পাননি এবং বাইরে ফেলে দেওয়া কোনো বস্তুও তাঁদের চোখে পড়েনি।

২: অর্থাৎ, তাঁর ধারণা ছিল যে, ছেলেটি কোনো জিন বা এ ধরনের অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে পড়েছে।

৩: ইবনে হিশাম।

৪: সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, বাবুল ইসরা।

৫: কিছু পাঠক হয়তো 'কাশফ' (আধ্যাত্মিক দর্শন) পরিভাষাটির সঙ্গে পরিচিত নন। তাই তাঁদের অবগতির জন্য বলা হচ্ছে যে, মানুষ যেমন রাতে ঘুমের সময় কোনো দৃশ্য দেখে এবং তখন সেটিকে বাস্তব বলে মনে করে, যদিও তা প্রকৃতপক্ষে একটি স্বপ্ন-তেমনি কখনও কখনও আল্লাহর বিশেষ বান্দাগণ জাগ্রত অবস্থাতেও এ ধরনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন।

অর্থাৎ, জাগ্রত অবস্থায় তাঁদের ওপর এমন এক বিশেষ অবস্থা আপতিত হয়, যাতে তাঁরা বাহ্যিক ইন্দ্রিয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে (অথবা কখনও বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সচল থাকা সত্ত্বেও) কোনো বিশেষ দৃশ্য অবলোকন করেন। এ ধরনের অবস্থায় যে দৃশ্য তাঁরা দেখেন, তাকে পরিভাষায় 'কাশফ' বলা হয়।

কখনও কখনও কাশফ এমনও হয় যে, এর প্রভাব একাধিক ব্যক্তির ওপর পড়ে। অর্থাৎ, কাশফপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়াও অন্য লোকেরাও সেই একই দৃশ্যে অংশগ্রহণ করে বা তা প্রত্যক্ষ করে। -

১: সহীহ আল-বুখারী, বাবুল মিরাজ।

# সীরাতুল মাহদী

*-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.*

{৭৪} আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

মুলতানের মিয়াঁ ফখরুদ্দীন সাহেব আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সময়ে আমার পিতা কাদিয়ানে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রবল বিরোধী এবং প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কে কটূক্তি করতেন। এখানে এসেও তিনি অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য করতে থাকেন। মুলতানে থাকাকালীন তিনি বলতেন, "যদি কখনো মির্জার সাথে সাক্ষাৎ হয়, তাহলে আল্লাহ না করুন, আমি তার মুখের উপর অভিশাপ দেব। এখানে তার সম্পর্কে যা বলি, তা সরাসরি তাকে বলব।"

যাই হোক, আমি তাকে হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করাতে নিয়ে গেলাম। যখন হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন আমার পিতা সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর ভয়ে অভিভূত হয়ে তিনি পিছিয়ে গিয়ে বসে পড়লেন। সমাবেশে আরও অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বসে থেকেই সমাবেশকে সম্বোধন করতে শুরু করলেন। তিনি বারবার বললেন, "আমরা চাই যে লোকেরা আমাদের কাছে আসুক, আমাদের কথা শুনুক এবং আমাদের প্রশ্ন করুক। এ উদ্দেশ্যে আমরা তাদের জন্য ব্যয় করতেও প্রস্তুত। কিন্তু লোকেরা আসে না, আর যদি আসেও, তারা চুপচাপ বসে থাকে। পরে তারা চলে যায় এবং আমাদের পেছনে কথা বলে।"

এভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) খোলাখুলিভাবে কথা বললেন এবং বিস্তারিতভাবে তাঁর বাণী পৌঁছে দিলেন। কয়েকবার তিনি উপস্থিত লোকদের কথা বলতে এবং প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করলেন।

আমার পিতা খুবই বাকপটু বলে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু যেন তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না।

আমরা চলে আসার পর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন তুমি সেখানে কথা বললে না?" তিনি এড়িয়ে যাওয়া জবাব দিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন।

মিয়াঁ ফখরুদ্দীন সাহেব বলতেন যে, এই ভাষণের সময় প্রতিশ্রুত মসীহ সরাসরি তাঁর পিতাকে সম্বোধন করেননি। বরং তিনি পুরো সমাবেশের প্রতি একটি সাধারণ ভাষণ দিয়েছিলেন।

{৭৫} আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

হজরত আমিরুল মুমিনীন, দ্বিতীয় খলিফা বর্ণনা করেছেন যে, একবার গুজরাট থেকে এক হিন্দু ব্যক্তি বিয়ের দলের সাথে কাদিয়ানে এসেছিলেন।

এই ব্যক্তি ইলম-এ-তাওয়াজ্জুহ (মানসিক একাগ্রতা বা মানসিক প্রভাবের গুপ্তবিদ্যা)-এর অনুশীলনে অত্যন্ত দক্ষ বলে বিবেচিত হতেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন, "যেহেতু আমরা কাদিয়ানে এসেছি, চলো মির্জা সাহেবের সাথে দেখা করে আসি।"

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল লোকদের সামনে তাঁর কথিত ক্ষমতা প্রদর্শন করা- প্রতিশ্রুত মসীহের উপর মানসিক প্রভাব বিস্তার করে সমাবেশের মাঝে তাঁকে কিছু বোকামি কাজ করানো।

যখন তিনি মসজিদে প্রতিশ্রুত মসীহের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন তিনি তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ তিনি কাঁপতে শুরু করলেন। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে আবার চেষ্টা করতে লাগলেন, আর হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) আগের মতোই কথা বলতে থাকলেন।

আবার তাঁর শরীরে প্রচণ্ড কাঁপুনি উঠল এবং ভয়ের এক অনৈচ্ছিক শব্দ তাঁর ঠোঁট থেকে বেরিয়ে এল। তবুও তিনি আবার নিজেকে সংযত করলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি হঠাৎ জোরে চিৎকার করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রচণ্ড আতঙ্কে, জুতো পরারও সময় না পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামলেন।

তাঁর সঙ্গীরা এবং উপস্থিত অন্যান্যরা তাঁর পেছনে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরলেন এবং শান্ত করলেন। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন তিনি ব্যাখ্যা করলেন:

"আমি মানসিক একাগ্রতার বিদ্যায় অত্যন্ত দক্ষ। আমি মির্জা সাহেবের দিকে আমার প্রভাব পরিচালিত করতে চেয়েছিলাম যাতে সমাবেশের সামনে তাঁকে কিছু অর্থহীন কাজ করাতে পারি। কিন্তু যতক্ষণে আমি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলাম, ততক্ষণে আমি দেখতে পেলাম আমার সামনে অল্প দূরে একটা সিংহ বসে আছে। তার দৃশ্যে আমি কেঁপে উঠলাম। তারপর আমি অন্তরে নিজেকে তিরস্কার করলাম, ভেবে যে এটা কেবল আমার কল্পনা।

তাই আমি আবার মির্জা সাহেবের দিকে আমার একাগ্রতা নিবদ্ধ করলাম। আবার আমি সেই একই সিংহকে আমার সামনে দেখতে পেলাম, কেবল এবার সে আরও কাছে এসেছে। আমার পুরো শরীর প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল, কিন্তু আমি নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলাম এবং আবার নিজেকে তিরস্কার করলাম, বিশ্বাস করে যে কল্পনাজাত ভয় আমাকে অভিভূত করেছে।

তারপর আমি দৃঢ় সংকল্প ও মানসিক শক্তি একত্রিত করলাম এবং সর্বশক্তি দিয়ে আবার মির্জা সাহেবের দিকে আমার পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করলাম।

হঠাৎ আমি দেখলাম সেই একই সিংহ আক্রমণ করতে গিয়ে আমার দিকে লাফিয়ে উঠছে। সেই মুহূর্তে আমি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম, চিৎকার করে সেই স্থান থেকে পালিয়ে গেলাম।"

হজরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলতেন যে, এই ঘটনার পর সেই ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর একজন নিবেদিত ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের বাকি সময় তিনি তাঁর সাথে পত্রালাপ অব্যাহত রেখেছিলেন।

{৭৬} আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

বিনীত বর্ণনাকারী জানাচ্ছেন যে, কাপুরথালার প্রয়াত মুন্সি মুহাম্মদ আরোড়া সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলতেন: "আমরা আপনার পবিত্র মুখমণ্ডলের দর্শনের জন্য ক্ষুধার্ত ছিলাম। এমনকি যখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়তাম, কেবল আপনার মুখমণ্ডলের দিকে তাকালেই আমরা সুস্থ হয়ে যেতাম।" বিনীত বর্ণনাকারী আরও জানাচ্ছেন যে, প্রয়াত মুন্সি সাহেব প্রতিশ্রুত মসীহের প্রাথমিক আন্তরিক ভক্তদের মধ্যে ছিলেন এবং তিনি সেই সকলের অগ্রগণ্য সারিতে গণ্য হওয়ার যোগ্য ছিলেন যারা তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন।

{৭৭} আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

হজরত মাওলভী নূরউদ্দীন সাহেব, প্রথম খলিফা, বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সময়ে তিনি ভ্রমণ করছিলেন। যখন তাঁরা এক রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছালেন, তখন ট্রেন আসতে এখনও কিছু সময় বাকি ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) তাঁর স্ত্রীর সাথে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটতে শুরু করলেন।

এটি দেখে মাওলভী আব্দুল করীম সাহেব, যাঁর স্বভাবে প্রচণ্ড উৎসাহ ও সম্মানবোধ ছিল, আমার কাছে এসে বললেন, "এখানে অনেক লোক, এমনকি অপরিচিতরাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনুগ্রহ করে প্রতিশ্রুত মসীহকে অনুরোধ করুন যেন তিনি তাঁর স্ত্রীকে আলাদা করে বসিয়ে দেন।"

মাওলভী নূরউদ্দীন সাহেব বললেন, "আমি জবাব দিলাম, 'আমি এমন কথা বলব না। আপনি চাইলে নিজেই চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'"

অন্য কোনো উপায় না পেয়ে মাওলভী আব্দুল করীম সাহেব নিজেই হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) কাছে গিয়ে বললেন, "হুজুর, এখানে অনেক লোক আছে। অনুগ্রহ করে আপনার স্ত্রীকে আলাদা করে বসিয়ে দিন।"

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) জবাব দিলেন, "যাও, প্রিয়। আমি এ ধরনের পর্দায় বিশ্বাস করি না।"

মাওলভী নূরউদ্দীন সাহেব বলতেন যে, এরপর মাওলভী আব্দুল করীম সাহেব মাথা নিচু করে তাঁর কাছে ফিরে এলেন। আমি তাঁকে বললাম, "কী হলো, মাওলভী সাহেব, আপনার উত্তর নিয়ে এসেছেন?"

{৭৮} আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

বিনীত বর্ণনাকারী জানাচ্ছেন যে, যে দিনগুলোতে আমাদের ছোট ভাই মুবারক আহমদ অসুস্থ ছিলেন, তখন একবার হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) হজরত মাওলভী নূরউদ্দীন সাহেব, প্রথম খলিফাকে বাড়ির ভিতরে ডেকে পাঠালেন যাতে তিনি তাঁকে পরীক্ষা করেন। সেই সময় হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) উঠানের এক খাটিয়ায় বসেছিলেন। মাটিতে কোনো কার্পেট বা চাটাই বিছানো ছিল না।

মাওলভী নূরউদ্দীন সাহেব আসতেই তিনি খাটিয়ার পাশে খালি মাটিতে বসে পড়লেন। হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বললেন, "মাওলভী সাহেব, অনুগ্রহ করে খাটিয়ায় বসুন।" মাওলভী সাহেব জবাব দিলেন, "হুজুর, আমি তো ইতিমধ্যেই বসে আছি, "এবং কেবল সামান্য উঠে এক হাত খাটিয়ার উপর রেখে বসলেন।

যখন হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) নির্দেশটি আবার দিলেন, তখন মাওলভী সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে খাটিয়ার পাদদেশের একেবারে কিনারায় বসলেন। বিনীত বর্ণনাকারী জানাচ্ছেন যে, হজরত মাওলভী নূরউদ্দীন সাহেবের মধ্যে আনুগত্য ও সম্মানবোধ সর্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

## যুগ ইমামের বাণী

**যদি খোদাকে দুনিয়াতে দেখতে চাও তাহলে তাঁর পথে উৎসর্গীত হয়ে যাও। যদি দুনিয়াতেই খোদাকে দেখতে চাও, তাহলে তাঁর জন্য আত্মবিলীন হও, সর্বতোভাবে তাঁরই হয়ে যাও। (রাযে হাকীকাত, পৃ: ১১)**

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum and Family, Bhagbangola, (MSD)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
akhbaarbadarbanglaqdn@gmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 32 Aug 2026 Issue No.32

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১পাতার পর....

সৃষ্টি হতো না। আর যদি জনগণ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তবে প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোর উচিত তাদের সাহায্য করা, অধিকার আদায়ে সহায়তা করা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা।

আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ইন্দোনেশিয়ায় এমন কোনো আইন নেই, যা আমাদের অধিকার প্রয়োগে বাধা দেয়। তবে কিছু এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু পাকিস্তানের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে সরকারের প্রণীত আইনের মাধ্যমে আমাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী আমল করতে পারি না এবং স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করতে পারি না। তবে আমাদের বিশ্বাস, এমন এক সময় আসবে যখন আমরা সমগ্র বিশ্বে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারব। ইনশা আল্লাহুল আজীয।

সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিটে সাক্ষাৎকার শেষ হয়।

অক্টোবর, শনিবার, ২০১৩

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) ভোর ৫টা ১০ মিনিটে মসজিদ বায়তুল হুদা-য় গিয়ে ফজরের নামাজে ইমামতি করেন। নামাজ শেষে হুযূর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) তাঁর আবাসস্থলে ফিরে যান।

সকালে হুযূর আনওয়ার দাপ্তরিক ডাক, বিভিন্ন রিপোর্ট এবং বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ফ্যাক্স ও রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন এবং সেগুলোর ওপর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ১১টায় হুযূর আনওয়ার তাঁর দপ্তরে আসেন।

SBS রেডিও স্টেশনের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার

অস্ট্রেলিয়ার সরকারি রেডিও স্টেশন SBS-এর একজন প্রতিনিধি হুযূর আনওয়ারের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য পূর্ব থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। SBS জাতীয় পর্যায়ের একটি সরকারি রেডিও স্টেশন। এই রেডিও স্টেশন থেকে বিশ্বের ৭৪টি ভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়।

সাংবাদিক প্রথমে প্রশ্ন করেন, আহমদিয়া জামাআতের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলুন। আহমদিয়া জামাআতের প্রতিষ্ঠা কখন এবং কীভাবে হয়েছিল? এই আন্দোলনের সূচনা কীভাবে হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) বলেন-

"এটি বুঝতে হলে আপনাকে চৌদ্দশ বছর পেছনে যেতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের শুধু নামটুকুই অবশিষ্ট থাকবে। কুরআনের শুধু শব্দ থাকবে, কিন্তু তার প্রকৃত শিক্ষা থাকবে না। সেটি হবে এক অন্ধকার যুগ। তখন চতুর্দশ শতাব্দীতে আল্লাহ তা'আলা একজন সংস্কারক প্রেরণ করবেন। তিনি হবেন মসীহ ও মাহদির উপাধিধারী এবং উম্মতে মুসলিমার মধ্য থেকেই আগমন করবেন। তিনি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং ইসলামের প্রকৃত ও বিশুদ্ধ শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

আমরা বিশ্বাস করি, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই আগত মসীহ ও মাহদি সমস্ত নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন, যেগুলো মহানবী (সা.) তাঁর আগমন সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি ১৮৮৯ সালে আহমদিয়া জামাআতের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করেন।

মহানবী (সা.) আগত মসীহ ও মাহদির সত্যতার যেসব নিদর্শন বর্ণনা করেছিলেন, তার একটি ছিল রমজান মাসে নির্ধারিত তারিখে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হওয়া। অতএব, যখন হযরত আকদাস মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.), যাঁকে আমরা আগত মসীহ ও মাহদি হিসেবে মানি, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মসীহ ও মাহদি হওয়ার দাবি করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আহমদিয়া জামাআত প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁর দাবির পর ১৮৯৪ সালে পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে রমজান মাসে নির্ধারিত তারিখে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ ঘটে। পরের বছর, ১৮৯৫ সালে, পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে রমজান মাসে নির্ধারিত তারিখে একইভাবে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়। এটি ছিল তাঁর দাবির সত্যতার সমর্থনে আল্লাহ তা'আলার এক নিদর্শন।

তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'আমিই সেই মসীহ ও মাহদি, যার আগমনের সংবাদ মহানবী (সা.) দিয়েছিলেন। আমার আগমনের উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন তাদের প্রতিপালককে চিনতে পারে, তাঁর দিকে ফিরে আসে এবং মানুষ যেন মানুষের অধিকার আদায় করে।' সুতরাং আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায়ের জন্যই তিনি আহমদিয়া জামাআত প্রতিষ্ঠা করেন।"

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ১৮৮৯ সালে তিনি যখন আহমদিয়া জামাআত প্রতিষ্ঠা করলেন, তাঁর ইন্তেকালের পর কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল? খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি কী? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনওয়ার বলেন-

"আমাদের কোনো বিষয়ই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা থেকে পৃথক নয়। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। এরপর নবুওয়তের আদর্শে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। পরে আল্লাহ যখন ইচ্ছা করবেন, এই নিয়ামতও উঠিয়ে নেবেন। এরপর অত্যাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তা শেষ হলে আরও কঠোর স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এক অন্ধকার যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় নবুওয়তের আদর্শে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমরা বিশ্বাস করি, যেমন তাঁর পর খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনি তারই ধারাবাহিকতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে পুনরায় শুরু হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর জামাআতের সদস্যরা হযরত মাওলানা হাকিম নূরুদ্দীন (রা.)-কে প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় খিলাফতের নির্বাচন হয় এবং হযরত মির্জা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন।

হুযূর বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের সময় জামাআতের সদস্যসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ ছিল। আজ আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে পৃথিবীর ২০৪টি দেশে এই সংখ্যা কোটি ছাড়িয়েছে।

বর্তমানে খলিফা নির্বাচনের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক ইলেক্টোরাল কলেজ রয়েছে। এতে জামাআতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-আঞ্জুমান, তাহরীকে জাদীদ ইত্যাদির দায়িত্বশীলগণ, জ্যেষ্ঠ মুবাল্লিগ, বিভিন্ন দেশের আমীর এবং আরও কিছু সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকেন। তাঁরা সবাই একত্রিত হয়ে খলিফা নির্বাচন করেন।১৯৮২ সালে তৃতীয় খলিফার ইন্তেকালের পর রাবওয়ায় চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন।

১৯৮৪ সালে জেনারেল জিয়াউল হক একটি অত্যাচারী অধ্যাদেশ জারি করেন, যার মাধ্যমে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয় এবং ইসলামী বিশ্বাস প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। 'আসসালামু আলাইকুম' বলার জন্যও কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান করা হয়। এ অবস্থায় চতুর্থ খলিফা পাকিস্তান থেকে লন্ডনে হিজরত করেন, কারণ খলিফা হিসেবে তিনি পাকিস্তানে তাঁর দায়িত্ব পালন এবং জামাআতকে পরিচালনা করতে পারছিলেন না।

২০০৩ সালে লন্ডনে তাঁর ইন্তেকালের পর লন্ডনের মসজিদ ফজল-এ পঞ্চম খিলাফতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। 'মসজিদ ফজল' লন্ডনের সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ। ২২ এপ্রিল ২০০৩ সালে সেই নির্বাচনে আমাকে খলিফা নির্বাচিত করা হয়।"

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা রয়েছে যে হযরত মির্জা গোলাম আহমদ (আ.) নিজেকে নবী দাবি করেছিলেন।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনওয়ার বলেন-

"এই ভবিষ্যদ্বাণী তো মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকেই ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে আগত মসীহ আসবেন, তিনি 'নবিয়ুল্লাহ' হবেন।

সাধারণ মুসলমানদের বিশ্বাস, আগত মসীহ হলেন হযরত ঈসা (আ.), যিনি আসমানে জীবিত আছেন এবং ভবিষ্যতে অবতরণ করবেন। তাঁদের মতে, মসীহ ও মাহদি দুইজন পৃথক ব্যক্তি। মসীহ আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং মাহদি উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মধ্য থেকে আগমন করবেন। এরপর তাঁরা উভয়ে মিলিতভাবে কাজ করবেন, তলোয়ার চালাবেন, ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন এবং শূকর হত্যা করবেন।

সাধারণ মুসলমানদের বিশ্বাস, হযরত ঈসা (আ.) আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং পূর্বের নবী হিসেবেই আসবেন। তাঁর আগমনে খাতমে নবুওয়াতের মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বনি ইসরাঈলের জন্য নবী করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন পুনরায় আসবেন, তখনও নবী হিসেবেই আসবেন। আল্লাহ কাউকে নবী করে পরে সেই মর্যাদা ফিরিয়ে নেবেন-এটি হতে পারে না। অতএব মহানবী (সা.)-এর পরে একজন নবীর আগমনে সাধারণ মুসলমানেরাও বিশ্বাস করেন। (বাকি পরের সংখ্যায়..)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir